৬.১৩ কে এই নররাক্ষস – Bangla Library

৬.১৩ কে এই নররাক্ষস – Bangla Library

৬.১৩ কে এই নররাক্ষস

কে এই নররাক্ষস– ৯৩

মৃতদেহটার উপরে এবার টর্চের আলো ফেললো বনহুর।

সঙ্গে সঙ্গে দস্যুরাণী আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো–এ যে মঙ্গল।...

চন্দনাও ভয়ার্তকণ্ঠে বলে উঠলো–রাণী, মঙ্গলকে এভাবে হত্যা করে তার হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে বের করে নিয়েছে।

দস্যুরাণী থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। মঙ্গল তার বিশ্বস্ত অনুচর তার উপর দস্যুরাণীর অনেক ভরসা ছিলো। রায়হান থেকে আসার সময় মঙ্গলকে নিয়ে এসেছিলো সে, কারণ রহমতের পরেই ছিলো মঙ্গলের আসন বা স্থান। সেই মঙ্গলের এ অবস্থা দেখে দস্যুরাণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো।

চন্দনা তো দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বললো বনহুর–রাণীজী, তোমার যাত্রা শুভ হয় নি, তার প্রমাণ তুমি হাতে–হাতে পাচ্ছে। যে কারণে কান্দাই এসেছে তা সফল হবে না কোনোদিন, বরং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, হারালে তোমার একজন প্রিয় অনুচরকে।

দস্যুরাণী নিপ, সে কোনো কথা বললো না।

চন্দনা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলেও সে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দস্যুরাণীর গা ঘেঁষে। চোখ দুটোকে সে আর কিছুতেই নিহত মঙ্গলের দিকে ফিরাতে পারছে না।

দস্যুরাণীর সঙ্গে কাটিয়ে যদিও তাকে বহু বীভৎস মৃতদেহ দেখতে হয়েছে, তবু এমন হত্যাকান্ড সে আর কোনোদিন দেখেনি। কোনো কথা নেই কারও মুখে, দস্যুরাণী কিংবা চন্দনা। ওরা যেন হাবা বনে গেছে একেবারে।

বনহুর বললো–রাণীজী, জেনে রাখো, কে এই নর রাক্ষস আমি তার আসল পরিচয় খুঁজে বের করবোই এবং তা করতেই হবে আমাকে। নাহলে এই নররাক্ষস কান্দাইবাসীদের সুখ–শান্তি হরণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি চাই তুমিও আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করবে।

দস্যুরাণী নিশ্চুপ, বাকহীন।

গোটা রাতটা কোনো রকমে কাটলো। পরদিন ভোর হবার পূর্বে বনহুর বললো–মঙ্গলের মৃতদেহ নিয়ে বেশি ভেবে লাভ হবে না রাণীজী, চলো তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

দস্যুরাণী আর চন্দনা সমস্ত রাত বসে বসে কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলো। বনহুরের কথায় তারা কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে গাড়ির দিকে অগ্রসর হলো। বিদায় হবার পূর্বে আর একবার রাণী এবং চন্দনা দেখে নিলো মঙ্গলের বিকৃত মৃতদেহটা।

রুমালে চোখ মুছলো দস্যুরাণী। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো এ দৃশ্যটা, যখন মঙ্গলকে সে নির্দেশ দিয়েছিলো–ও মঙ্গল, তোমার সঙ্গীদের নিয়ে হীরামন কলোনীতে যাও। হীরামন কলোনীর চারপাশ ঘিরে আত্নগোপন করে থাকবে। দস্যু বনহুরের সাক্ষাৎলাভ ঘটলেই আমি সংকেতধ্বনি করবো। ঠিক ঐ সময় তোমরা দ্রুত এসে পড়বে এবং ঘিরে ফেলবে দস্যুটাকে যেন সে পালাতে সক্ষম না হয়।

মঙ্গল মাথা দুলিয়ে বলেছিলো–আপনার আদেশ যথাযথভাবে পালন করবো রাণীজী……ওর উপর কত আস্থা ছিলো, কত ভরসা ছিলো দস্যুরাণীর।

রাণীকে গভীরভাবে চিন্তা করতে দেখে বললো বনহুর–এখন এখানে বিলম্ব করা উচিত হবে না, চলো রাণীজী।

রাণী আর চন্দনা বনহুরের পিছনে পিছনে গাড়িখানার দিকে এগিয়ে চললো।

*

পোড়োবাড়ির মৃতদেহ নিয়ে শহরে আবার শুরু হলো চাঞ্চল্য, হুলস্থুল।

পুলিশমহলে এমনিই তো ব্যস্ততার অন্ত ছিলো না। প্রতিদিন একটা না একটা এই রহস্যময় হত্যাকান্ড চলেছে।

পুলিশ সুপার মিঃ লোদী এখন কান্দাইয়ের পুলিশ প্রধান। কাজেই তার চিন্তা সবচেয়ে বেশি। মিঃ হারুন, মিঃ কিবরিয়া, মিঃ জ্যাকি এরা সবাই এই হত্যারহস্য উদঘাটন ব্যাপারে মিঃ লোদীকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে চলেছেন। তাদের আহার ন্দ্রিা যেন চিরতরে অন্তর্হিত হয়েছে।

হীরাময় কলোনীর সন্নিকটস্থ পোড়োবাড়ির মধ্যে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির বীভৎস বিকৃত মৃতদেহ পাওয়ার পর কান্দাই শহরে আরও বেশি চাঞ্চল্য এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। সবার মুখের হাসি মুছে গেছে, ভয়ার্তভাবে চলাফেরা করছে সবাই।

সকলের মনে সন্দেহ, এ কাজ দস্যু বনহুরের। সে ছাড়া এমন নৃশংস হত্যাকান্ড অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়। তবে অনেকের ধারণা এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছে কোনো জন্তুর দ্বারা। মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম করার পর ডাক্তারী রিপোর্টে জানা যায়, এ হত্যাকান্ড কোনো জানোয়ার দ্বারাই সংঘটিত হয়ে চলেছে।

কান্দাইবাসীরা কেউ এখনও সঠিক জানতে পারেনি কে এই হত্যাকারী, দস্যু বনহুর না অন্য কেউ বা কোনো জানোয়ার। সবার মনেই নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছে, কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করতে সক্ষম হচ্ছে না।

শুধু বনহুর জানে, আর জানে দু'জন–তারা হলো স্বয়ং দস্যুরাণী আর চন্দনা। তারা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না কি করে একটা মানুষ এভাবে মানুষের বুক চিরে তার হৃৎপিন্ডসহ কলিজা বের করে চিবিয়ে খেতে পারে। এমন মানুষনামী জানোয়ার অমানুষ কে এই ব্যক্তি!

দস্যু বনহুর গোপনে সন্ধান চালিয়ে চললো, এই হত্যাকান্ডের অধিনায়ক যে একজন মানুষ তা সে নিজ চোখে দেখেছে।

দস্যু বনহুর যখন ব্যস্তসমস্ত তখন দিপালী কাজে নেমে পড়েছে। শুধু ফুল্লরাকে খুঁজে বের করাই তার কাজ নয়, সেও এই হত্যারহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছে, তবে প্রকাশ্যে নয়, গোপনে।

দিপালী একদিন বেদেনীর বেশে শহরে পথে পথে সাঁপের ঝুড়ি কাঁধে ঘুরে ফিরছিলো, সাপ খেলা দেখবে সাপ খেলা...সাপ খেলা দেখবে, সাপ খেলা......

বেলা গড়িয়ে এসেছে।

পাহাড়ের কোল বেয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে শহরের দিকে সেই পথ ধরেই দিপালী চলেছে। এক পা ধূলো, গা বেয়ে ঘাম ঝরছে।

মাথার উপরে প্রখর সূর্যের তাপ আগুন ছড়াচ্ছে।

বেদেনীবেশী দিপালী একটা গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো। মৃদুমন্দ বাতাস তার তাপদগ্ধ দেহে শীতল পরশ বুলিয়ে দিলো।

গাছটার নিচে বসলো দিপালী।

এমন সময় একটা গাড়ি এসে নিকটে প্রেমে পড়লো। দিপালী চমকে তাকালো তার দিকে।

গাড়ি থেকে ততক্ষণে নেমে দাঁড়ালো এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটার চেহারা দেখে দিপালী একটু ভড়কে গেলো। কারণ ভদ্রলোকের চেহারা স্বাভাবিক নয়– মাথার লম্বা চুল, চোখ দুটো কেমন যেন ড্যাব ড্যাব করছে। এগুলো কেমন খাড়া খাড়া। দেহে মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ। পায়ে ভারী বুট, গলায় একটা চেনমালা।

জামার কিছুটা খোলা থাকায় বুকের কিছুটা অংশ নজরে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন একখানা প্রশস্ত মাঠ ঢাকা পড়েছে দু'পাশের আবর্জনায়। লোকটা গাড়ি থামিয়ে নেমে দাঁড়ালো, তারপর এগুলো সে দিপালীর দিকে।

দিপালী বিস্ময়ত দৃষ্টি মেলে তাকালো লোকটার দিকে। এখানে সে ছাড়া আর তো কেউ নেই, তবে কি লোকটা তার দিকে এগুচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালো দিপালী, সাপের ঝুড়িটা তুলে নিলো কাঁধে, সম্মুখে পা বাড়াতেই লোকটা বললো– শোনো!

দিপালী থমকে দাঁড়ালো কিন্তু সে তার দিকে ফিরে তাকালো না। বুকটা ওর টিপ টিপ করছে, এতটা সে ভয় পেতো না যদি আশেপাশে লোকজন থাকতো।

তাকালো দিপালী।

লোকটা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

কাছাকাছি এসে বললো লোকটা–তোমার ঝুড়িতে কি সাপ বিষধর সাপ না দাঁতভাঙা সাপ?

দিপালী ওর মুখে দৃষ্টি স্থির রেখে বললো–বিষধর!

লোকটা হেসে উঠলো–অদ্ভুত সে হাসি হাসি থামিয়ে বললো–বিষধর সাপই আমার চাই। বলো বেদেনী, কত টাকা তুমি চাও এই সাপের বিনিময়ে?

দিপালী এই সময়ের মধ্যে বুকে সাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে, সে যে কাজে নেমেছে তাতে তার মন থেকে ভয়ভীতি মুছে ফেলতে হবে। সাহস তাকে জয়ী করবে, সাহস তাকে উৎসাহ যোগাবে, সাহস তাকে প্রেরণা দেবে, তাই দিপালী সাহসকে মনে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে কথা বললো–সাপ খেলা দেখিয়ে আমি পয়সা উপার্জন করি, তাই দিয়ে সংসার চলে……

তোমাকে আর সাপ খেলা দেখাতে হবে না তুমি যদি আমার কথা শোন। বললো লোকটা।

দিপালী বললো–বলুন কি কথা?

শুধু তোমার সাপটা আমার কাছে বিক্রি করবে।

এই কথা?

হাঁ, বলো কত টাকা তুমি চাও?

যা চাইবো তাই দেবেন আপনি?

হাঁ, তাই দেবো। যত টাকা চাইবে তাই দেবো কিন্তু সাপ আমার বাসায় পৌঁছে দেবে।

আপনার বাসায় সাপ পৌঁছে দেবো আমি…না, তা পারবো না। সাপ আমি বিক্রি করবো না।

সত্যি বলছো পারবে না?

না।

তোমাকে যেতেই হবে আমার ওখানে……লোকটা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তার বলিষ্ঠ হাতখানা বাড়িয়ে দিলো দিপালীর দিকে।

দিপালী ওর কাছে সিংহের মুখে মেষশাবকের মত অসহায়, তাই তাড়াতাড়ি বললো–চলুন কোথায় যেতে হবে।

লোকটা বললো–সাপের ঝুড়ি নিয়ে গাড়িতে উঠে বসো।

দিপালী এবার লোকটার কথামত গাড়ির দিকে এগুলো।

লোকটা গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দাঁড়াতে উঠে বসলো দিপালী।

ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো লোকটা।

দিপালীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো ছায়াশীতল সেই বড় গাছটা! একটা ভীতি ভাব যদিও দিপালীকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো তবু সে নিজকে সহজ রাখার চেষ্টা করলো। কারণ যে কাজে সে শপথ নিয়েছে, সে কাজ তাকে সমাধা করতেই হবে। এজন্য তাকে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় তাও ভালো।

গাড়িতে বসে বললো–বাবু, হামি কোনো দিন গাড়িতে বসিনি, বড় ডর লাগছে!

ড্রাইভ করে চলেছে লোকটা, বললো–আমি আছি, কোনো ভয় ডর নেই, বুঝলে বেদেনী?

বাবু, তবু ডর লাগছে।

এই তো এসে গেছি.......সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো লোকটা।

নির্জন পথ বেয়ে গাড়িখানা তীরবেগে ছুটে চলেছে।

যেন উড়ে চলেছে তারা কোনো অজানার পথে।

দিপালীর মনে নানা চিন্তা এলোমেলো পাক খাচ্ছে। কে এই লোক যে তাকে সাপ কিনবে বলে নিয়ে যাচ্ছে। যত টাকা সে চাইবে তাই দেবে বলেছে। শুধু সাপ কেনাই যদি তার মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে গাড়িতে তুলে নেবে কেন? কিন্তু কে দেবে তার জবাব, একমাত্র ঈশ্বরকে স্মরণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এক সময় গাড়িখানা এসে একটা হোটেলের পিছন অংশে থামলো। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো লোকটা, বললো নেমে এস।

নেমে এলো দিপালী।

সঙ্কোচিতভাবে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো। কাঁধে তার সাপের ঝুড়ি।

বললো লোকটা এসো আমার সঙ্গে।

দিপালী তাকে অনুসরণ করলো। হোটলের পিছন অংশে একটা কাঠের সিঁড়ি রয়েছে। লোকটা সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

পিছনে দিপালী সাপের ঝুড়ি নিয়ে উপরে উঠছে। বুক তার কাঁপলেও উঠে এলো উপরে সে।

হোটেলের এক কোণে একটা ঘর ঠিক একপাশে।

লোকটা দিপালীকে বললো–এসো।

দিপালী লম্বা টানা বারান্দা বেয়ে এগুলো।

মস্ত এক তালা ঝুলছে দরজায়।

ভদ্রলোক তালা খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো।

এবার কিন্তু দিপালী বেশ ঘাবড়ে গেলো। এতক্ষণ হোটেলের টানা বারান্দা বেয়ে আসার সময় সে হোটেলের কামরাগুলোতে একটি জনপ্রাণীও দেখতে পায়নি। দিপালী ভাবছে এ আবার কি ধরনের হোটেল, যে হোটেলে কোনো খদ্দের নেই।

কক্ষে প্রবেশ করতেই ভদ্রলোক ফিরে তাকিয়ে বললো–এসো, অনেক টাকা পাবে। আর কি চাও বলো

দিপালী বললো–আর কিছু চাই না, শুধু টাকা পেলেই খুশি হবো।

লোকটা বললো–বসো। কথাটা বলে ওর হাত থেকে সাপের ঝুড়িটা নিয়ে টেবিলে রাখলো।

দিপালী বললো–বসবো না, শুধু টাকা পেলেই খুশি হবো।

লোকটা বললো–আচ্ছা তাই দিচ্ছি।

লোকাটা পাশের কক্ষে চলে গেলো।

দিপালী ভাবছে পালাবে কিনা, কিন্তু পালিয়ে কি লাভ হবে–সে তো জানতেই চায় কে এই লোক এবং কি এর উদ্দেশ্য। জানতেই হবে তাকে যেমন করে থোক, ভয় পেলে তার চলবে না। মৃত্যুকে জয় করতে হবে……।

ফিরে এলো লোকটা, হাতে তার একটা প্যাকেট।

বলো দিপালী সত্যি লোকটা তাহলে মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে তাকে এখানে আনে নি। সাপটা তার কাছে কিনে নিতে চায় আর তাকে দিতে চায় প্রচুর অর্থ কিন্তু সাপ নিয়ে কি করবে লোকটা,

ততক্ষণে একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে লোকটা।

দিপালী তাকালো তার দিকে।

লোকটা কাছে এসে দাঁড়াতেই পিছনের দরজা আপনা–আপনি বন্ধ হয়ে গেলো।

চমকে উঠলো দিপালী, বিমর্ষ মুখে তাকালো সে বন্ধ দরজার দিকে।

দরজা কে বন্ধ করলো, কেন বন্ধ হলো কিছুই দিপালী বুঝতে পারছে না। দিপালী তার সাপের ঝুড়ির দিকে হাত বাড়ালো।

লোকটা বললো–ওদিকে হাত বাড়াবে না, কারণ ও সাপ তুমি আর পাবে না।

দিপালীর কানে কথাগুলো বড় কঠিন লাগলো। লোকটা প্যাকেট খুলে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটের ভিতর থেকে বের হলো একটা অস্ত্র–অদ্ভুত ধরনের সে অস্ত্র। দিপালীর চোখ দুটো ছানাবড়া হলো, সে তাকালো অস্ত্রটার দিকে।

লোকটা তখন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলোসাপ নয়, তোমাকে চাই..........তোমার এই নরম বুকের ভিতর আছে আরও নরম কলিজা আর হৃৎপিন্ড.......আমি তাই চাই.....লোকটা অদ্ভুত ধরনের অস্ত্রটা হাতের মুঠায় চেপে ধরে আরও এগিয়ে এলো।

দিপালী ভায়াভাবে পিছু হটে সরে যাচ্ছে। বারবার সে ঢোক গিলছে, এই কি তবে সেই ব্যক্তি যে শহরের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। একদিকে ভয়, একদিকে খুশিও লাগছে তার–এত সহজে সে কান্দাই হত্যারহস্যের মূল স্থানে এসে হাজির হবে, ভাবতেও পারে নি। দিপালী বুকে সাহস সঞ্চয় করে নিলো, বললো–বলুন আপনি কি চান?

হাসলো লোকটা, বিকট সে হাসি, বললো–আমি কি চাই জানতে চাও? আমি চাই তোমার কলিজাসহ হৃৎপিন্ড......।

ওঃ! আপনি আপনিই সেই......ঢোক গিলে কথাটা বলে হাসার চেষ্টা করলো দিপালী।

লোকটা বললো–হাঁ, আমি...আমিই সেই ব্যক্তি, যার প্রতিদিনের আহার একখন্ড তাজা কলিজা আর তাজা হৃৎপিন্ড! আমি তোমার হৃৎপিন্ড আর কলিজা খেয়ে মহাতৃপ্তি লাভ করবো। কেউ তোমাকে আমার কবল থেকে রক্ষা করতে পারবে না......

দিপালী মুখখানাকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বললো–এ তো ভালো কথা। আপনি যখন আমার নরম বুক চিরে নরম কলিজা আর হৃৎপিন্ড খাবেন, এটাতো আমার সৌভাগ্য........

কি বললে, এটা তোমার সৌভাগ্য?

হাঁ, সৌভাগ্য নয়তো কি? আমি বেদের মেয়ে। ছোটলোক গরিব মানুষ, সারাটা দিন পথে পথে সাপের ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াই, কোনোদিন ভাল উপার্জন হয়, কোনোদিন হয় না। যেদিন কোনো পয়সা পাই না, সেদিন না খেয়ে থাকতে হয়......কাঁদো কাঁদো সুরে বলে এবার দিপালী– এত দুঃখ–ব্যথা যাদের, তাদের বেঁচে থেকে লাভ কি? তাই আপনাদের মত মহৎ মহান ব্যক্তিরা যদি আমাদের মত

দীনহীন গরিবদের বুকের রক্ত পান করে কিংবা কলিজা বা হৃৎপিন্ড খেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন তাহলে এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে।

তুমি দেখছি সুন্দর কথা বলতে পারো?

বেদের ঘরে জন্ম হলেও কিছু লেখাপড়া করেছিলাম, তাই হয়তো সুন্দর কথা বলতে পারি। হাঁ, কি বলছিলাম আমার হৃৎপিন্ড আর কলিজা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করবেন কিন্তু আমার মত আরও অনেক তরুণ তরুণী আছে যাদের কলিজা, হৃৎপিন্ড আরও নরম, আরও সুন্দর।

হাঃ হাঃ হাঃ, তা তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না, যখন যাকে হাতের কাছে পাবো, ঠিক তোমার মত তখন তার বুক চিরে বের করে নেবো কলিজা আর হৃৎপিন্ড। তুমি রেহাই পাবে না আমার কবল থেকে।

দিপালী মনে মনে শিউরে উঠলেও প্রকাশ্যে মুখোভাব স্বাভাবিক রেখে বললো– আমার হাতে বহু তরুণ–তরুণী আছে, দয়া করে আপনি যদি আমাকে রেহাই দেন, তবে আমি প্রতিদিন আপনাকে একটা করে তরুণ বা তরুণী এনে দেবো।

লোকটার চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে ভাবলো কথাটা মন্দ নয়, একে জীবিত রেখে এর দ্বারা বহু তরুণ–তরুণীকে আয়ত্তে আনতে পারবে এবং তাদের বুক চিরে কলিজাসহ হৃৎপিন্ড খাওয়া সম্ভব হবে। এই ভেবে লোকটা হাতের অস্ত্রখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো–তোমাকে এক শর্তে আমি জীবিত রাখতে পারি, তুমি যদি প্রতিদিন আমাকে একটা করে তরুণ–তরুণী জোগাড় করে দিতে পারো.....

আমি কথা দিলাম দেবো, আপনি আমাকে মুক্তি দিন। আমাকে মুক্তি দিন......

সত্যি তোমাকে মুক্তি দিলে তুমি আমার কথামত কাজ করবে?

করবো।

বেশ, তাই হোক, কিন্তু মনে রাখবে, যদি প্রতিদিন তুমি আমাকে একজন জীবন্ত মানুষ এনে দিতে না পারো তাহলে তোমার জীবননাশ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবো না এবং কেউ তোমাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

বেশ, আমি রাজি আছি! বললো দিপালী।

লোকটা এবার একড়া নোট বের করে দিপালীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো–এই নাও টাকা, আর তুমি সাপ খেলা দেখাবে না। এখন থেকে তোমার কাজ হলো প্রতিদিন একটা করে মানুষ সংগ্রহ করে দেওয়া।

আচ্ছা বাবু, তাই হবে!

তুমি রোজ একটা লোককে নিয়ে ঐ গাছের তলে হাজির থাকবে, আমি গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাবো, তারপর তাকে তুলে নেবো গাড়িতে।

দিপালী তাড়াতাড়ি সাপের ঝুড়ি তুলে নিলো কাঁধে, তারপর বেরিয়ে গেলো যে পথে এসেছিলো সেই পথে।

*

সত্যি তুমি যেভাবে কাজ করেছে সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। দিপালী, আজ তুমি যাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে হলো আমি! কথাগুলো বলে থামলো বনহুর।

দিপালী বলে উঠলো–কিন্তু আপনি জানেন না কত ভয়ঙ্কর, কত নিষ্ঠুর সেই ব্যক্তি!

জানি, আরও জানি তার নাম মিঃ নোমান।

মিঃ নোমান!

হাঁ।

আপনি কি করে জানলেন?

আমার সঙ্গে ওর পরিচয় বেশ কিছুদিনের...একটু থেমে বললো বনহুর–কোনো এক পার্টিতে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তখন জানতে পারি তার নাম কিন্তু সে কি করে তা সেদিন জানতে পারিনি, জানতে পেরেছিলাম অনেক পরে। লোকটাকে প্রথম সাক্ষাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো, নিশ্চয়ই সে বিশেষ কোনো ব্যক্তি। এখন বুঝতে পারছি এ সেই ব্যক্তি যার দ্বারা কান্দই শহরে এ আতঙ্ক সৃষ্টি

হয়েছে। মানুষখেকো নয়, মানুষের বুক চিরে কলিজা আর হৃৎপিন্ড ভক্ষণকারী এই নোমান। হাঁ, আমি যাবো তোমার সঙ্গে...

কিন্তু......।

কোনো কিন্তু নয়, আমাকে বাধা দিও না দিপালী–আমি যাবো, নইলে মিঃ নোমান মানে নররাক্ষসটা তোমাকে রেহাই দেবে না, যেমন করে হোক খুঁজে বের করবেই সে তোমাকে।

তবু আপনাকে আমি মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারি না।

হাসলো বনহুর–তুমি কি জানো না দিপালী, মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই।

জানি!

তবু কেন বলছো? দিপালী, তোমার কাজ এ ব্যাপারে শেষ হয়েছে। এবার আমার কাজ। তোমাকে এ বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম শুধু নোমানের আসল পরিচয় জানার জন্য। সত্যি নোমান নররাক্ষস কিনা তাই জানতে চেয়েছিলাম......যাক এ সব কথা, এবার তুমি বেদেনীর বেশে তৈরি হয়ে নাও, আর আমি.......বলো দিপালী, কোন্ বেশ ধারণ করে মিঃ নোমানের সম্মুখে হাজির হব? বলল, তুমিই বলো দিপালী?

যা আপনার ভাল লাগে।

দিপালী, একদিন আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতে কিন্তু আজ কাল আপনি বলতে শুরু করেছো......।

না, তুমি বলে ভুল করেছিলাম। আপনার কাছে আমি তুচ্ছ নগন্যা, তাই......

তাই তুমি বেশি সম্মান দেখাচ্ছো?

হয়তো তাই.......রাজকুমার, একদিন আমি আপনাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু......

এখন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারো না, তাইনা?

ঠিক তা নয়!

তবে কি

আজ আমি বলতে পারবো না রাজকুমার।

তাহলে রাজকুমার বোলো না, কারণ সে সম্পর্ক তুমি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

না না, আমাকে রাজকুমার বলা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

আমার কাছে আপনি সেই রাজকুমার, যাকে আমি কল্পনার চোখে দেখেছিলাম, ভালবেসেছিলাম অন্তর দিয়ে.......।

দিপালী!

হাঁ, আমি চাই আপনি চিরদিন আমার কাছে সেই অচেনা অজানা রাজকুমার হয়ে থাকবেন।

বেশ, তাই হবে। যা তোমার মন চায় তাই বলে ডেকো। এখন যাও দিপালী, ও বেশ পরিবর্তন করে এসো।

দিপালী চলে গেলো।

বনহুর আংগুল থেকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে খুঁজে উঠে দাঁড়ালো।

দিপালী বেদেনীর বেশে বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে চমকে উঠলো–এ যে সেই রাজকুমার......থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই বনহুর বললো–দিপালী, এই বেশে যাবো তোমার সেই মিঃ নোমানের কাছে!

দিপালী বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো বনহুরের দিকে। মনিমুক্তা খচিত মূল্যবান রাজকীয় পোশাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে।

গলায় মুক্তার মালা, আংগুলে হীরার আংটি।

দিপালী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে।

বনহুর হেসে বললো–কি দেখছো দিপালী?

কিছুনা!

চলো তাহলে! তোমার সাপের ঝুড়ি কই?

ঐ তো আছে। দিপালী এগিয়ে যায়, সাপের ঝুড়িটা তুলে নেয় কাঁধে।

সেই বটগাছ।

গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো বেদেনীবেশি দিপালী আর রাজকুমারের বেশে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

প্রখর রৌদ্রের তাপে আঁ আঁ করছে চারদিক।

গাছের ডালে নাম না জানা পাখিরা ভীড় জমিয়ে পাকা ফল খাচ্ছে। টুপ টাপ করে পাকা ফলগুলো মাটিতে ঝরে পড়ছে।

মাঝে মাঝে দমকা ঠান্ডা বাতাস তাপদস্থ দেহে শীতল পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে।

দিপালীর চুলগুলো এলিয়ে আছে পিঠে, কাঁধে আর ঘাড়ে। ললাটে ছোট্ট করে সাপের ছবি আঁকা। নাকে বালি, কানে ঝুমকো। হাতে বালা, পায়ে মল। কাঁধে সাপের ঝুড়ি।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো দিপালীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। নিখুতে সেজেছে দিপালী, কেউ বলবে না সে বেদেনী নয়। চমৎকার লাগছে ওকে।

ঐ মুহূর্তে গাড়ির শব্দ ভেসে আসে তাদের কানে।

বনহুর লক্ষ্য করলো, দূরে অনেক দূরে ধূলো উড়িয়ে একটা কালো গাড়ি এগিয়ে আসছে।

দিপালী বললো–ঐ গাড়িখানাই মিঃ নোমানের।

হাঁ দিপালী, তুমি ঠিক ধরেছো।

বনহুর পকেটে হাত পুরে তার রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করে নেয়। বলে সে দিপালীকে লক্ষ্য করে–তোমাকে যা বলেছি সব মনে আছে তোত

আছে। কিন্তু আপনার জন্য আমার ভয় পাচ্ছে...

ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, ভীষণ...

হেসে বলে বনহুর–তুমি নারী হয়ে তাকে কৌশলে বাগিয়ে চলে এলে, আর আমি তাকে বাগাতে পারবো না দিপালী?

জানি পারবেন তবু ভয় হয় যদি কোনোক্রমে সে আপনাকে হত্যা করে বসে? উঃ! কি ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যাকান্ড....

ততক্ষণে গাড়িখানা একেবারে কাছে এসে গেছে।

দিপালী আর বনহুরের সম্মুখে এসে থেমে পড়লো এবার গাড়িখানা।

বনহুর নিজের মুখখানাকে কোমল করে নিয়ে গোবেচারীর মত হাসতে লাগলো। অবুঝ বুদ্ধিহীনের মত সে হাসি।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো মিঃ নোমান।

জীবন্ত একটা যমদূত বলা চলে তাকে।

গাড়ি থেকে নেমে সে দিপালী আর বনহুরের দিকে এগুলো।

রাজকুমার তখন দিপালীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ নোমার দিপালীর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাকালো রাজকুমারবেশী বনহুরের দিকে। নোমান ভালভাবে লক্ষ্য করে রাজকুমারকে দেখে নিয়ে খুশিভরা কণ্ঠে বললো–বাঃ চমৎকার! একটু থেমে বললো–তুমি বেদের মেয়ে, এমন এক রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় হলো কি করে?

দিপালী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো–সে এক কাহিনী... থাক পরে বলবো। চলুন আপনার বাসায়, সেখানে বসে সব কথা হবে। এসো রাজকুমার........ও, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেইনি। ইনি কান্দাই

শহরের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। আর ইনি হলেন মহেন্দ্রর রাজকুমার হিরন্ময় সেন। বড় ভাল, উনার কাছে ছোটবড় সবাই সমান এবং সে কারণে উনার সঙ্গে আমার পরিচয়।

মিঃ নোমান গম্ভীর গলায় বললো, বুঝলাম। ওকে দেখেই মনে হচ্ছে বড় ভাল লোক। থাক এমন লোককেই তো আমি খুঁজছি যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আরাম পাবো।

মিঃ নোমান রাজকুমারের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বারবার তাকাতে লাগলো।

দিপালী বললো–রাজকুমারকে পছন্দ হয়েছে তো?

খুব.......আসুন রাজকুমার, আমার গাড়িতে উঠে বসুন।

মিঃ নোমান বলে উঠলোনা, ওর যাবার কোনো দরকার হবে না। ওর সঙ্গে আমার কাল দেখা হবে।

মিঃ নোমান কথাটা বলে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

রাজকুমার হিরন্ময় উঠে বসলো গাড়িতে।

দিপালী আর রাজকুমারের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো শেষ বারের মত।

মিঃ নোমার গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা স্পীডে ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর মৃদু মৃদু হাসছিলো। মনে মনে বলছিলো, নোমান, তুমি জানো না কাকে নিয়ে চলেছে। রাজকুমারের বেশে কে আমি। আমাকে তুমি চেনো না। আর চিনবেই বা কেমন করে? আজ আমি তোমার শিকার হিসেবে চলেছি। আমার বুক চিরে তুমি আমার হৃৎপিন্ড আর কলিজা খাবে। কত সুন্দর তোমার অভিসন্ধি,.....

ড্রাইভ আসনে বসে নোমানও ভাবছে, কে আমি তুমি যদি জানতে তাহলে আমার গাড়িতে উঠে বসতে না রাজকুমার। অচেনা বন্ধুকে তুমি বিশ্বাস করেছে, কিন্তু জানোনা আমার আসল পরিচয়। একদিন আমিও তোমাদের মত সভ্য মানুষ ছিলাম। আমারও বাবা–মা–আত্নীয়স্বজন সব ছিলো কিন্তু আজ আমি

তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি.......আজ আমার প্রধান খাদ্য নরমাংস......কে আমি, আমার পরিচয় কেউ জানে না।

একসময় গাড়িখানা এসে পৌঁছে গেলো সেই হোটেলের পেছন অংশে, কিন্তু হোটেল প্রাঙ্গণে বহু জনসমাবেশ লক্ষ্য করে গাড়িখানাকে পিছু হটিয়ে নিয়ে এলো হোটেল ছেড়ে দূরে।

রাজকুমারবেশী দস্যু বনহুর বুঝতে পারলো হোটেল যাওয়াটাএ–মুহূর্তে তার জন্য নিরাপদ নয়, তাই সে অন্য পথ ধরলো, কিন্তু দিপালী পুলিশ ফোর্স নিয়ে সোজা আসবে এই হোটেলে......

মিঃ নোমান বলে উঠলো বন্ধু, তোমাকে নিয়ে হোটেলে বসবো কিন্তু তা হলো না। হোটেল প্রাঙ্গণের মানুষগুলো তোমাকে দেখলে নানা প্রশ্ন করে বসবে, এত প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে রাজি নই।

বললো বনহুর–তাহলে আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো বন্ধু

এক নির্জন স্থানে শুধু আমরা দুজন বসে আলাপ–আলোচনা করব। বেদেনী তোমাকে সব কথা খুলে বলেনি?

হাঁ, বলেছিলো। আর সব কথা শোনার পরই তো আমি এসেছি বন্ধু.........

যাক তুমি তাহলে নিশ্চিন্ত, কি বলো?

হাঁ, আমি সব চিন্তা–ভাবনা মুছে ফেলে তোমার সান্নিধ্য লাভ করবো এবং আমার জীবন সার্থক হবে তোমার মত বন্ধু পেয়ে।

ঠিক বলেছো বন্ধু.......ড্রাইভ করতে করতে বলে মিঃ নোমান।

গাড়ি তখন তীরবেগে ছুটে চলেছে।

শহর ছেড়ে পর্বতের দিকে এগুচ্ছে গাড়িখানা। নির্জন পথে একপাশে পর্বতমালা, অন্যপাশে খাদ। পর্বতের পাশ কেটে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির আভাস।

মিঃ নোমার হ্যান্ডেল চেপে ধরে দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালাচ্ছে।

বনহুর পিছন আসনে, ইচ্ছা করলে সে মিঃ নোমানকে এই মুহূর্তে কাবু করে ফেলতে পারে, পকেটে তার আগ্নেয়াস্ত্র আছে, তা ছাড়া আছে তার বিরাট শক্তি ও মনোবল। নোমানকে এই মুহূর্তে কাবু করতে তার বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তার আসল পরিচয় এবং সত্যি সে এই হত্যাকারী কিনা, সঠিকভাবে জানা দরকার। তাই তাকে জানতে হবে.......

গাড়িখানা বেগে ছুটছিলো।

চুপচপে বসে আছে বনহুর, তার দক্ষিণ হাতখানা ঠেকে আছে পকেটের রিভলভারের বাটে।

একপাশে পর্বতমালার সারি, অপরপাশে খাদ। মিঃ নোমান গাড়ি চালিয়ে চলেছে। পথটা বড় দুর্গম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

একসময় গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলো মিঃ নোমান ও রাজকুমার তাদের গাড়িখানা নিয়ে।

নির্জন পর্বতমালার পাদমূলে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো মিঃ নোমান।

রাজকুমার হিরন্ময়বেশী দস্যু বনহুর হাবাগোবার মত নেমে দাঁড়ালো গাড়ি থেকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে কতকটা নির্বোধের মত।

মিঃ নোমান গাড়ির পেছন আসনের তলা থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করে নিলো হাতের মুঠায়, তারপর রাজকুমারকে লক্ষ্য করে বললো–এসো বন্ধু, এমন এক নিরাপদ জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাবো, যেখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না। আমি আর তুমি গোপনে সব আলাপ করবো। সব কথা বলবো তোমাকে........

একটু হাবা হাসি হেসে বললো রাজকুমার—এই তো বেশ নির্জন জায়গা, এখানে কি আমাদের আলাপ হতে পারে না বন্ধু?

বললো মিঃ নোমান–এখানে কেউ আসতে পারে.......।

বেশ, তাহলে উপরে চলো বন্ধু।

পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো মিঃ নোমান। তার পিছনে এগুতে লাগলো বনহুর, যেন সে কিছু বোঝে না, জানে না–হাবাগোবা রাজকুমার।

মিঃ নোমান মাঝে মাঝে পিছনে তাকিয়ে দেখতে লাগলো রাজকুমার ঠিকভাবে আসছে কিনা।

অনেক উপরে উঠে এসেছে নোমান।

চোখ দুটো তার জ্বলছে। হাতের মুঠোয় প্যাকেটখানা মজবুত করে ধরে রেখেছে।

প্রায় ঘন্টা তিন–চার চলার পর তারা পর্বতের এমন এক স্থানে পৌঁছলো যেখান থেকে নিচের পথ যেন নজরে আসে না। পথের পাশে ছড়ানো পাথরগুলো এক একটা ক্ষুদ্র মার্বেলের মত মনে হচ্ছে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো নিচে তাদের গাড়িখানাকে একটা খেলনা গাড়ির মত লাগছে। মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। তার মনে জাগলো একটা চিন্তা, এততক্ষণে দিপালী পুলিশ। বাহিনী সহ সেই হোটেলে গিয়ে হাজির হয়েছে। মিঃ নোমান ও রাজকুমার হিরন্ময়কে সন্ধান করে ফিরছে। কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান না পেয়ে পুলিশবাহিনী দিপালীকে সন্দেহ করে বসেছে, নিশ্চয়ই তাকে পুলিশ ক্ষমা করবে না। মিথ্যে কারসাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করবে.......

কি ভাবছো বন্ধু?

চমকে ফরে তাকালো রাজকুমার, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে স্তব্ধ হলো সে মুহূর্তের জন্য। দেখলো মিঃ নোমানের হাতের মুঠায় সেই অদ্ভুত অস্ত্রখানা সূর্যের আলোতে ঝকমক করছে।

বনহুর ফিরে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ নোমান হেসে বললো এসো বন্ধু, এবার আমরা আলাপ আলোচনা শুরু করি।

রাজকুমারের দৃষ্টি স্থির হলো মিঃ নোমানের দিকে।

নোমানের দেহ বস্ত্রশূন্য, শুধু একটা প্যান্ট রয়েছে লজ্জা নিবারণের জন্য। দু'চোখে ওর আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। মাথার লম্বা চুলগুলো কেমন যেন খাড়া খাড়া লাগছে। জোড়া শক্ত এবং মোটা হয়ে উঠেছে। দেহে জামা না থাকার জন্য দেহটা স্পষ্ট নজরে এলো। বিরাট চওড়া প্রশস্ত বুক, লোমশ দুটি বাহু। দক্ষিণ হাতে সেই অদ্ভুত অস্ত্রখানা শক্তভাবে ধরে রেখেছে সে।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিলো।

মিঃ নোমান এগুচ্ছে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে রাজকুমারবেশী বনহুর পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিলো কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার, মিঃ নোমান শিকারী বাঘের মত চোখের পলকে লাফিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

ছিটকে পড়লো রিভলভারখানা দূরে।

বনহুর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ নোমান ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকের উপর।

বনহুর এক সেকেন্ড বিলম্ব না করে মিঃ নোমানের হাতখানা ধরে ফেললো অস্ত্র সহকারে।

সেকি ভীষণ শক্তি মিঃ নোমানের দেহে!

বনহুর কৌশলে মিঃ নোমানের হাত থেকে উদ্ভুত অস্ত্রখানা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু কিছুতেই নোমানকে কাবু করতে পারছে না সে। একটু অসাবধান হলেই তাকে নররাক্ষস নোমানের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তার বুক চিরে হৃদপিণ্ডটা আর কলিজা বের করে খাবে সে.......কিন্তু কিছু ভাববার সময় তার এখন নেই। যেমন করে থোক ওকে কাবু করতেই হবে। প্রাণপণে বনহুর নোমানের হাতখানাকে মোচড় দিয়ে অস্ত্রখানা ফেলে দিতে বাধ্য করলো।

এবার শুরু হয় মল্লযুদ্ধ।

ভীষণ শক্তিশালী মিঃ নোমানের কাছে বনহুর যেন শিশু। মিঃ নোমান যেমন আকারে বিরাটদেহী, তেমনি শক্তিতে ভয়ঙ্কর। রাক্ষস আর মানব–সন্তানে যুদ্ধ চলেছে যেন।

তুমুল যুদ্ধ।

বনহুর কিছুতেই পেরে উঠছে না।

নিঃ নোমান অস্ত্রটা হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

বনহুর আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে। চলেছে ধস্তাধস্তি আর ঘুষাঘুষি।

বনহুরও কম নয়, তার এক একটা ঘুষি গিয়ে পড়ছে মিঃ নোমানের নাকে-মুখে-চোখে।

যত শক্তিশালীই হোক না কেন মিঃ নোমান, তার নাক–চোখ ভীমরুলের কামড়ে যেমন চোখমুখের অবস্থা হয় তেমনি হয়ে উঠলো। নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বনহুরের নাক দিয়েও রক্ত ঝরছে। ঠোঁটের একপাশে কেটে গেছে, সেখান দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছে। বনহুর মরিয়া হয়ে লড়ছে।

হঠাৎ এক সময় মিঃ নোমান ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গিয়ে সেই অদ্ভুত অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলো, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিঃ নোমানের উপর। মিঃ নোমান টাল সামলাতে পারলো না, সে আচমকা পর্বতমালার সুউচ্চ স্থান থেকে গড়িয়ে পড়লো নিচে। বনহুরও পড়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু ভাগ্য ভাল, দেহের ভারসাম্য নিজেকে রক্ষা করে নিলো।

পাথরে টক্কর খেয়ে খেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মিঃ নোমান।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই তার দৃষ্টি পড়লো মিঃ নোমানের দিকে। নোমানের দেহটা প্রায় পর্বতমালার পাদমূলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। বনহুর

রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছিলো, সে আরও ভালভাবে ঝুঁকে দেখলো।

ততক্ষণে মিঃ নোমানের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটা পর্বতের নিচে ঠিক নোমানের থেমে থাকা গাড়িখানার সম্মুখে পথের উপর স্থির হয়ে গেছে।

বনহুর কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো নোমানের দেহটার দিকে। যদিও বহু উঁচু থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবু বেশ বোঝা যাচ্ছিলো মিঃ নোমানের কাজ শেষ হয়ে গেছে, বুক চিরে আর সে নর–কলিজা আর হৃৎপিন্ড খেতে পারবে না।

বনহুর ফিরে দাঁড়িয়ে তুলে নিলো হাতে সেই অদ্ভুত অস্ত্রখানা যা দিয়ে মিঃ নোমান এতকাল নরহত্যা করে এসেছে।

বনহুর অস্ত্রখানা ভালভাবে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো। কি সাংঘাতিক অস্ত্র যা বনহুর কোনোদিন দেখেনি। ছোট ভাজকরা একটা প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো এই ভয়ঙ্কর মারাত্নক অস্ত্র, যে অস্ত্র দ্বারা মানুষের বুক অনায়াসে দ্বিখন্ডিত করে মিঃ নোমান কলিজা আর হৃৎপিন্ড খেয়ে চলেছিলো। আপন মনে বলে উঠলো বনহুর–সররাক্ষস নোমানের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে.......

বনহুর হাতের পিঠে ঠোঁট এবং নাকের রক্ত মুছে ফেললো। নিজের রাজকুমারের পোশাক এলোমেলো হয়ে পড়েছিলো, আবার সে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিলো।

এক সময় নেমে এলো সে গাড়িখানার পাশে।

দেখল মিঃ নোমানের মাথাটা সম্পূর্ণ থেতলে গেছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে পাথুরিয়া পথটার শুকনো পিঠ।

বনহুর ভাবলো কে এই নোমান তা কেউ জানবে না কোনোদিন, তাই সে পকেট থেকে কলম আর একখন্ড কাগজ বের করে নিলো কিছু লিখলো, তারপর তা মিঃ নোমানের প্যান্টের সঙ্গে আটকে দিলো, আর সেই অদ্ভুত অস্ত্রখানা রেখে দিলো ওর হাতের মুঠায়।

এবার বনহুর মিঃ নোমানের গাড়িতে চেপে বসলো।

গাড়িখানা পর্বতমালার পথ ধরে ছুটতে শুরু করলো। নোমান রাজকুমারের বুক চিরে কলিজা আর হৃৎপিন্ড খাবে, তারপর সে এমনিভাবে এই পথে ফিরে যাবে তা নয়, ফিরে চলেছে নোমানের শিকার রাজকুমারবেশী স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মিঃ নোমান জানলো না কে সে এ রাজকুমার। জানবার পূর্বেই সে পরপারে যাত্রা করলো।

এদিকে বনহুর যখন মিঃ নোমানকে পরপারে পাঠিয়ে শহর অভিমুখে ফিরে চললো তখন পুলিশ বাহিনী মিথ্যা বলার অভিযোগে দিপালীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে পুলিশ অফিসে।

দিপালী বেদেনী বেশে পুলিশকে গিয়ে জানিয়েছিলো নররাক্ষস মিঃ নোমানের কথা। পুলিশ তার কথায় বিশ্বাস করে হাজির হয়েছিলো সেই হোটেলে কিন্তু কাউকে খুঁজে পায়নি। নররাক্ষস মিঃ নোমান বা রাজকুমার কাউকে দেখা যায়নি সেখানে। পুলিশ তাই সন্দেহ করে দিপালীকে গ্রেপ্তার করে এবং তাকে নিয়ে যায়।

দিপালীকে গ্রেপ্তার করা হলো বলে তার মনে দুঃখ বা ভয় নেই, তার চিন্তা কোথায় গেলো মিঃ নোমান তার রাজকুমারকে নিয়ে।

পুলিশ বাহিনীসহ দিপালী যখন সেই হোটেলে উপস্থিত হলো, তখন সে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো, কারণ সেই কক্ষের দরজা তালাবদ্ধ।

পুলিশ অফিসার দরজার তালা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলে দরজার তালা ভেঙে ফেলা হলো কিন্তু কক্ষ শূন্য, কেউ নেই সে কক্ষে।

দিপালী থ' মেরে গেছে।

তার মনে তখন দুশ্চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করেছে। কারণ সে জানে, ঐ মিঃ নোমান কত ভয়ঙ্কর, রাজকুমারবেশী বনহুরকে না জানি সে কোথায় বা তার হৃৎপিন্ড আর কলিজা খেয়ে সে তৃপ্তি লাভ করেছে........

দিপালীকে ভাবতে দেখে পুলিশ প্রধান এবং পুলিশ অফিসারগণ ঠিক ধরে বসলো বেদের মেয়েটিই দোষী এবং মিথ্যাবাদিনী। তাকে মিথ্যা বলে পুলিশকে ধোকা দেবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো।

দিপালীর মনে কিন্তু তখনও ঐ চিন্তা যে চিন্তা, তাকে একেবারে অস্থির করে তুললোনা জানি নোমান বনহুরকে কোথায় নিয়ে গেলো এবং তাকে কি করলো!

তবে কি তাকে সত্যি সে হত্যা করে বসেছে.......

পুলিশ অফিসারগণ যতই তাকে জেরা করছে ততই সে যেন হাবা বনে যাচ্ছে, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। তার চিন্তা তখন মিঃ নোমান আর বনহুর। না জানি বনহুরকে সঙ্গে নিয়ে সে কোথায় গেলো.....

পুলিশমহলে বেদেনীকে নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো, কারণ সে পুলিশদের কাছে প্রথম যেভাবে কথা বলেছিলো তা তার আচরণ যেরূপ ছিলো, এখন সে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না, শুধু নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে বধিরের মত।

মিঃ লোদী নিজে বেদেনীকে নানাভাবে প্রশ্ন করেও কোনো জবাব না পেয়ে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে তার মুখ খোলার নির্দেশ দিলেন। তিনি জানালেন, এই মেয়েটা নিশ্চয়ই হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে।

শুরু হলো দিপালীর উপর নির্যাতন।

জেরা চললো–বললো কে সেই হত্যাকারী যে কান্দাই মানুষের সুখ–শান্তি হরণ করে নিয়েছে।

কিন্তু দিপালী নির্বাক, সে কোনো জবাব দেয় না। আর জবাব দিলেই বা কে শুনবে বা বিশ্বাস করবে তার কথা।

সব চিন্তা ছাপিয়ে দিপালীর মনে ভাসছে সেই মুখখানা রাজকুমার বেশে স্বয়ং দস্যু বনহুরের মুখে। মনপ্রাণে সে কামনা করছে ওর যেন কোনো অমঙ্গল না হয় প্রভু!

দুদিন কেটে গেলো।

দিপালীকে বন্দী রেখে নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হচ্ছে কিন্তু সে কোনো উত্তর দিচ্ছে না। পুলিশমহল এ ব্যাপারে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেছে।

মিঃ লোদী এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার বসে আলাপ আলোচনা করছিলো।

বললেন মিঃ হারুন–আশ্চর্য, ঐ বেদের মেয়েটা গ্রেপ্তার হবার পর থেকে আর কোনো হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি স্যার।

মিঃ লোদী আপন মনে সিগারেট পান করছিলেন। তিনি কোনো জবাব দেবার পূর্বেই বলে উঠলেন মিঃ ফিরোজ–হাঁ স্যার, বিস্ময়করভাবে হত্যাকাণ্ড উবে গেছে...কোথাও কোনো হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি বা হচ্ছে না।

মিঃ লোদী বললেন–আমিও তাই লক্ষ্য করছি মিঃ ফিরোজ, বেদেনীর সঙ্গে এই হত্যাকান্ডের সংযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে। একটু থেমে বললেন কিন্তু বেদেনীকে এতভাবে নির্যাতন করেও তার মুখ থেকে কোনো কথা বের করা যাচ্ছে না।

মিঃ হারুন বললেন–পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ জাকারিয়া আমাকে সেই কথা জানিয়েছেন। তাকে যতই কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না কেন, সে নির্বাক রয়েছে। মনে হয় সে এ ব্যাপারে কোনো কথা জানে না।

মিঃ লোদী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সব সে জানে আর জানে বলেই সে এমন নির্বাক হয়ে গেছে। ওকে আরও কঠিন শাস্তি দিতে হবে যেন সে কথা বলতে বাধ্য হয় এবং সব কথা বলে।

মিঃ হারুন বললেন–স্যার, মিঃ জাকারিয়া যেভাবে বলেছেন তাতে মনে হয় সে আর কোনোদিন মুখ খুলবে না। গোয়েন্দা বিভাগের লোক সেই হোটেলে ভালভাবে সন্ধান নিয়ে চলেছে যদি কোনো হদিস পাওয়া যায়।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ কিবরিয়া। তিনি মিঃ লোদী এবং অন্যান্য অফিসারকে লক্ষ্য করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন–স্যার, একটা আশ্চর্য সংবাদ।

আশ্চর্য সংবাদ!

হা স্যার।

সবাই বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকালেন মিঃ কিবরিয়ার মুখের দিকে, না জানি কি সংবাদ তিনি বহন করে এনেছেন তিনিই জানেন।

মিঃ কিবরিয়ার চোখেমুখে একটা বিস্ময় ভাব ফুটে উঠেছে, বললেন তিনি–মিঃ নোমানের কক্ষে একটা ডায়রী পাওয়া গেছে। অদ্ভুত এবং আশ্চর্য সেই ডায়রী......স্যার, এই সেই ডায়রী.......

মিঃ কিবরিয়া পকেট থেকে ডায়রীখানা বের করে মিঃ লোদীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

মিঃ লোদী ডায়রীখানা হাতে নিলেন।

সবার চোখেই বিস্ময় এবং তারা সবাই ঐ ডায়রীখানার দিকে তাকিয়ে আছেন, না জানি ঐ ডায়রীখানার মধ্যে কি আছে!

মিঃ লোদী ডায়রীখানা যেমনি মেলতে যাবেন, অমনি হাঁপাতে হাঁপাতে কক্ষে প্রবেশ করলেন গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার নাম তার মিঃ মার্কোলা।

মিঃ মার্কোলা ব্যস্তকণ্ঠে বললেন–কান্দাই পর্বতমালার পাদমূলে একটা পথের উপরে মিঃ নোমানের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তার পাশেই পাওয়া গেছে একটা আশ্চর্যজনক অস্ত্র!

মিঃ নোমানের মৃতদেহ! অবাক কণ্ঠে বললেন মিঃ লোদী!

হা স্যার। বললেন মিঃ মার্কোলা।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন মিঃ লোদী–সেই বেদেনী পুলিশসহ মিঃ নোমানের কক্ষেই গিয়েছিলো এবং তাকে সেখানে না দেখে বেদেনী নির্বাক হয়ে যায়....

হাঁ, এ কথা সত্য! বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ কিবরিয়া বললেন–স্যার, তার চোখেমুখে আমরা একটা এমন ভাব দেখতে পাই যাতে তাকে আমাদের সন্দেহ হয়।

মিঃ লোদী ডায়রীখানা উঁচু করে ধরে বললেন–এই ডায়রীখানা মিঃ নোমানের কামরায় পাওয়া গেছে। এই ডায়রীর মধ্যেই আছে সবকিছু। তবে আশ্চর্য মিঃ

নোমান ঐ স্থানে গেলে কেন এবং তার মৃত্যুই বা ঘটলো কি করে?

মিঃ কিবরিয়া বললেন—সবই যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে স্যার।

হাঁ, আমার কাছেও সব যেন কেমন ঘোলাটে লাগছে! বললেন মিঃ লোদী।

মিঃ মার্কোলা বললেন—স্যার, সমস্ত ঘটনা শোনার পর আরও বিস্মিত হবেন।

বলুন কি ঘটনা? মিঃ লোদী প্রশ্ন করলেন।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মিঃ মার্কোলার মুখের দিকে।

মিঃ মার্কোলা বসে পড়লেন এবং মাথার ক্যাপটা খুলে রাখলেন টেবিলে। রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে বললেন—সংবাদ পেয়ে আমি নিজে সেখানে যাই এবং সব দেখে আসি। বিস্ময়কর ঘটনা স্যার, গিয়ে দেখি মিঃ নোমানের রক্তাক্ত মৃতদেহ ঠিক পথের উপরে পড়ে আছে। থেতলে বিকৃত হয়ে গেছে তার মাথাটা। চাপ চাপ রক্ত তার চারপাশে জমাট বেঁধে আছে এবং তার চোখমুখ রক্ত দিয়ে মাখানো। হাঁ, আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, তার মৃতদেহের পাশে পাওয়া গেছে একটা অদ্ভুত অস্ত্র। অস্ত্রখানা আমি সঙ্গে এনেছি।

একটা ছোট্ট প্যাকেট ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলে রাখলেন মিঃ মার্কোলা।

ওটাকে সামান্য প্যাকেট ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না।

মিঃ মার্কোলা প্যাকেটটা খুলে টেবিলে রাখলেন। সবাই দেখলেন, প্যাকেটটার ভিতরে একটা অদ্ভুত ধরনের অস্ত্র।

মিঃ লোদী ওটা তুলে নিলেন হাতে, বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে লাগলেন, কি আশ্চর্য—এটা দিয়ে তাহলে......

কি করতে মিঃ নোমান?

হাঁ, বিস্ময়কর বটে, এটা দিয়ে সে কি করতো?

সবার মনেই ঐ এক প্রশ্ন।

মিঃ মার্কোলা বের করলেন একটুকরা কাগজ, তারপর পুনরায় বললেন–আরও আশ্চর্য সংবাদ আছে। স্যার, এই কাগজখানা পড়ে দেখুন।

মিঃ লোদী বললেন–ওটাতে কি লেখা আছে

পড়ে দেখুন স্যার। এই কাগজখানা মিঃ নোমানের প্যান্টের সঙ্গে গাঁথা ছিলো।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন মিঃ লোদী–বলেন কি! হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন–

নররাক্ষস মিঃ নোমান আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই পর্বতমালার পাদমূলে নিয়ে এসেছিলো। উদ্দেশ্য আমার বুক চিরে কলিজা এবং হৃৎপিন্ড খাওয়া। কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দেইনি। পর্বতমালার সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে তাকে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছি। মিঃ নোমানই ছিলো কান্দাই হত্যারহস্যের নায়ক।

—দস্যু বনহুর

কক্ষে সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেনদস্যু বনহুর.......

মিঃ লোদী বললেন–হাঁ, দস্যু বনহুর মিঃ নোমানকে পর্বতমালার সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে নিচে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে।

মিঃ কিবরিয়া বললেন–তাহলে মিঃ নোমানই এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকান্ডের অধিনায়ক

মিঃ হারুন বললেন–তাইতো মনে হচ্ছে।

মিঃ লোদী বললেন–এবার হত্যারহস্য সম্পূর্ণ উদঘাটিত হবে বলে আশা করছি এবং তা উদঘাটিত হবে মিঃ নোমানের ডায়রী থেকে......কিন্তু দস্যু বনহুর মিঃ নোমানকে হত্যা করেছে–এর উদ্দেশ্য কি? সত্যি কি মিঃ নোমান তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলো?

মিঃ কিবরিয়া বললেন–দস্যু বনহুর নিজেও তো হত্যাকারী হতে পারে এবং সে নিজকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্যই মিঃ নোমানকে হত্যা করে তার হাতের

মুঠায় বা তার পাশে একটা অদ্ভুত অস্ত্র রেখে এবং তার বুকে একটা কাগজ এঁটে নিজের দোষ ঢাকা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে..

এ কথা মিথ্যা নয় মিঃ কিবরিয়া, দস্যু বনহুর হত্যাকারী না মিঃ নোমান হত্যাকারী তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই ডায়রীখানার মধ্যে। কারণ মিঃ নোমান জানতো না তার মৃত্যু এত শীঘ্র ঘটবে। এ ডায়রী সে এমন মুহূর্তে লিখেছে যখন তার মৃত্যু ঘটবে বা ঘটতে পারে, এ ধরনের চিন্তা তার মনে ছিলো না, কাজেই ডায়রীখানাই এ হত্যারহস্য উদঘাটনে আমাদের বিরাট সহায়ক।

মিঃ হারুন বললেন–শুধু হত্যারহস্যই উদঘাটিত হবে না, আরও একটা রহস্যের সমাধান হতে পারে তা হলো ঐ বেদের মেয়ের ব্যাপারখানা।

হাঁ স্যার, তাই মনে হচ্ছে। আমরা এ ডায়রীর মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবো। কথাটা বললেন মিঃ মার্কোলা। একটু থেমে আবার বললেন স্যার, মিঃ নোমানের মৃতদেহ এখনও শহরে নিয়ে আসা হয়নি। গোয়েন্দা বিভাগের লোক সংবাদ দেবার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মিঃ লোদী বললেন–লাশটা নিয়ে আসার পূর্বে আমরা একবার যেতে চাই সেখানে।

ঠিক বলেছেন স্যার, মিঃ নোমানের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, কাজেই দরকার সেখানে যাওয়া এবং মনোযোগ সহকারে তদন্ত করে দেখা। কথাগুলো বললেন মিঃ হারুন।

কান্দাই পর্বতমালার পাদমূলে যেখানে মিঃ নোমানের মৃতদেহ পড়ে ছিলো বা আছে সেখানে যাবার জন্য মিঃ লোদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার তৈরি হয়ে নিলেন।

ডায়রীখানা আপাততঃ মিঃ লোদী নিজের পকেটে রাখলেন।

মিঃ লোদী, মিঃ হারুন, মিঃ কিবরিয়া এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার রওনা দিলেন মিঃ নোমানের হত্যারহস্যের তদন্ত করার জন্য।

কথাটা দস্যুরাণীর কাছেও গিয়ে পৌঁছেছে।

দস্যুরাণী কোচওয়ানের বেশে এবং চন্দনা তার সহকারীরূপে রওনা দিলো। অবশ্য তার অনুচরগণকে বলে গেছে গোপনে অনুসরণ করে তাদের সন্ধান নিতে।

গাড়িখানা কান্দাই পর্বতমালার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। দস্যুরাণী আর চন্দনা পাশাপাশি বসেছিলো কোচবাক্সে। অবশ্য দস্যুরাণী নিজে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। এ কাজে সে দক্ষ বলা যায়।

ঘোড়াগাড়ি চালাতে কিছুমাত্র বেগ পাচ্ছে না দস্যুরাণী।

চন্দনা বললো–রাণী, সেখানে আছে বা থাকবে পুলিশবাহিনী, যদি তারা কোনোরকমে তোমাকে চিনে ফেলে?

আমি সেজন্য প্রস্তুত হয়েই চলেছি। তবে আমার বিশ্বাস, কেউ আমাকে চিনতে পারবে না।

ঘোড়াগাড়ি ছুটে চলেছে।

চন্দনাসহ দস্যুরাণী যখন কান্দাই পর্বতমালার নিকটে এসে পৌঁছলো তখন সেখানে পুলিশ বাহিনীর অনেক লোক গিয়ে হাজির হয়েছে।

মিঃ লোদী তার সহকারীদের নিয়ে লাশ তদন্ত করে চলেছেন।

এমন সময় পথের পাশ কেটে ঘোড়াগাড়িখানা চলে যাচ্ছিলো।

মিঃ লোদী গাড়িখানাকে রুখতে বললেন।

একজন পুলিশ দ্রুত এগিয়ে গেলো এবং ঘোড়াগাড়িখানাকে থামতে বললো।

কোচওয়ানবেশী দস্যুরাণী জানতে অসময়ে গাড়ির নিতান্ত প্রয়োজন, তাছাড়া এ পথে কোনো যানবাহন তেমন বেশি পাওয়া যায় না।

মিঃ লোদী যখন দেখলেন একটা ঘোড়াগাড়ি সেই পথে চলে যাচ্ছে তখন তিনি গাড়িখানার প্রয়োজন মনে করে রুখতে বললেন। লাশ শহরে নিয়ে যাবার জন্য ঘোড়াগাড়িখানা উপযোগী হবে।

পুলিশটার কথায় গাড়ি রুখলো দস্যুরাণী কিন্তু সে স্বীকার হলো না, জানালো লাশ সে শহরে নিয়ে যেতে পারবে না। মিঃ লোদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার তাকে বেশি পয়সার লোভ দেখালেন তবু দস্যুরাণী রাজি হলো না। এবার মিঃ লোদী তাদেরকে জেলে পুরবার ভয় দেখালেন।

অগত্যা রাজি হলো দস্যুরাণী আর চন্দনা।

দস্যুরাণী বললো–আমাকে লাশ দেখতে দিন, যদি লাশটা পছন্দ হয় তাহলে আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে নেবো.......।

মিঃ লোদী বললেন–বেশ, তাই হবে লাশ দেখো দেখলে অপছন্দ হবে না, আর যদি অপছন্দ হয় তবে মোটা অংক বকশিস পাবে।

দস্যুরাণী নিজের গোঁফে হাত বুলিয়ে চন্দনাকে লক্ষ্য করে বললো–আয় শঙ্করা, দেখি লাশটা পছন্দ হয় কিনা।

চন্দনা মাথার পাগড়িটায় হাত বুলিয়ে বললো–চলো দেখি।

দুই কোচওয়ানকে সঙ্গে করে একজন পুলিশ লাশটার পাশে এগিয়ে গেলো।

লাশটার উপর দৃষ্টি পড়তেই কোচওয়ানবেশী দস্যুরাণী চিনতে পারলো এই সে মিঃ নোমান যাকে সে হোটেলের কামরায় দেখেছিলো। সেই তবে হত্যাকারী? এই ব্যক্তিই তার বিশ্বস্ত অনুচরটাকে হত্যা করে খেয়েছিলো তার হৃৎপিন্ড আর কলিজা ভয়ংকর নররাক্ষস এই মিঃ নোমান...

চন্দনার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো দস্যুরাণীর।

চন্দনার চোখেমুখেও বিস্ময়, কারণ এই ভয়ঙ্কর লোকটাই সেদিন সেই পোড়োবাড়িটার মধ্যে তাদেরই একজনকে হত্যা করে তার বুক চিরে......

চন্দনা আর দস্যুরাণীর চিন্তায় বাধা পড়ে।

মিঃ হারুন বলেনকি ভাবছিস্ তোরা?

হুশ হলো উভয়ের, বললো দস্যুরাণী–এই লাশ আমরা গাড়িতে উঠাবো না।

বললেন মিঃ হারুন–কেন?

রাক্ষসের লাশ, কি ভীষণ আর ভয়ঙ্কর চেহারা, এমন লাশ আমরা গাড়িতে উঠাবো না। দস্যুরাণী বাঁকা হয়ে বসলো।

মিঃ লোদী তাকে অনেক টাকা দেবেন কথা দিয়ে লাশ তার ঘোড়াগাড়িতে উঠিয়ে দিলেন এবং দু'জন পুলিশকে সঙ্গে দিলেন।

কোচওয়ানবেশী দস্যুরাণী আর চন্দনা কোচবাক্সে উঠে বসলো।

হাসলো দস্যুরাণী।

চন্দনা বললো–আশ্চর্য, পুলিশ অফিসারগুলো কেউ তোমাকে বা আমাকে চিনতে পারলো না।

পুলিশদের মত সজাগ কেউ নেই, আবার তাদের মত সরল সহজ বুঝি আর হয় না। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, মিঃ নোমানই হত্যাকারী নররাক্ষস।

রাণী, সে দিন তাকে রাতের অন্ধকারে বনহুরের টর্চের আলোতে ভালভাবে চিনতে না পারলেও আজ দিনের আলোতে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে বেশ ভালভাবে বুঝলাম, হত্যাকারী আর কেউ নয়, ঐ শয়তান নররাক্ষস মিঃ নোমান।

হাঁ, যাকে তুই একদিন জীবনরক্ষাকারী মনে করে একনজর দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলি, সেই মিঃ নোমান। কোচবাক্সে বসে অশ্বের লাগাম মুঠায় চেপে ধরে কথাগুলো বললো দস্যুরাণী।

চন্দনা তার পাশে বসে জবাব দিচ্ছিলো।

ঘোড়াগাড়ির ভিতরে মিঃ নোমানের মৃতদেহ আর বাইরের পা–দানিতে দাঁড়িয়ে দু'জন পুলিশ।

বললো দস্যুরাণী–চন্দনা, জানিস্ মিঃ নোমানের হত্যাকারী কে?

তা কেমন করে জানবো?

ঐ তো মিঃ লোদী আর মিঃ কিবরিয়ায় যখন কথা হচ্ছিলো তখন তাদের আলাপ–আলোচনায় বুঝতে পারলাম মিঃ নোমানের হত্যাকারী দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর…বলো কি!

হাঁ, দস্যু বনহুর মিঃ নোমানকে পর্বতমালার সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে।

আশ্চর্য!

হাঁ, আশ্চর্যই বটে….দস্যু বনহুর বুঝতে পেরেছিলো কে এই রহস্যময় হত্যাকারী, তাই সে তাকে উচিত সাজা দিয়েছে।

নোমানের মৃত্যুতে তুমি খুশি হয়েছে রাণী?

অপরের মঙ্গল কামনাই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য যখন, তখন খুশি হয়েছি বইকি!

পুলিশ দু’জনের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো–আরে তোমরা ফিসফাস করে এত কথা বলছে কেন?

গলার স্বর মোটা করে বললো চন্দনা–আমরা কথা বলবো তাতে তোমাদের কি বেশি যদি কড়াকড়ি করো তাহলে লাশ কিন্তু পথে নামিয়ে রেখে চলে যাবো।

অপরজন সাথীকে লক্ষ্য করে বললো–কোচওয়ানদের বিগড়ে দিও না; শেষে লাশটা আমাদের দুজনেকে কাঁধে বয়ে শহরে নিয়ে যেতে হবে।

এরপর পুলিশদ্বয় আর কোনো কথা বললো না।

*

মনিরার ঘুম ভেঙে গেলো।

সজাগ হয়ে কান পাতলো সে, কেউ যেন তার মেঝেতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। চোখ মেলে ভালভাবে লক্ষ্য, করলো কিন্তু কিছু দৃষ্টিগোচর হলো না। শুধু জমাট অন্ধকার থমথম করছে। মনিরার দেহটা ভয়ে ক্রমে হিমশীতল হয়ে আসছে।

একমাত্র তার স্বামী ছাড়া এ কক্ষে কারও সাধ্য নেই এত রাতে প্রবেশ করে। সেই শুধু জানে এ কক্ষে প্রবেশ করতে হলে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কোন পথে আসা যায়।

তখনও ভারী জুতোর শব্দ তার কানে প্রবেশ করছে। শুধু জুতোর শব্দ নয়, নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে সে। চাপা নিঃশ্বাসের শব্দে মনিরা বালিশের তলায় হাত প্রবেশ করিয়ে রিভলভারখানা চেপে ধরলো। অন্ধকারেই পদশব্দ লক্ষ্য করে গুলী চুড়বে কিনা ভাবছে। তার পূর্বে বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালালো মনিরা, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো–তুমি!

সমস্ত দেহ ঘর্মাক্ত। কপালের একপাশে রক্ত জমাট বেঁধে আছে, ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছে। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মুক্তাবিন্দুর মত ফুটে উঠেছে গোটা মুখমন্ডলে। স্বামীকে এ অবস্থায় দেখে অবাক হলো মনিরা। বললো সে–তোমার এ অবস্থা কেন? ধীরে ধীরে রিভলভারসহ হাতখানা নামিয়ে নিলো মনিরা।

হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে ফিরে তাকালো বনহুর স্ত্রীর দিকে।

মনিরা বললো–চোরের মত চুপিচুপি আসার ফল তুমি এক্ষুণি পেতে……যদি এটা ব্যবহার করতাম……

এবার হাসলো বনহুর–তাই ভাল হতো মনিরা, অপরের হাতে মৃত্যুর চেয়ে তোমার রিভলভারের গুলীতে মৃত্যু অনেক শ্রেয় ছিলো। জানো, আজ সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি! একটু থেমে বললো বনহুর–এতক্ষণে নররাক্ষস আমার বুক চিরে কলিজা আর হৃৎপিন্ড খেয়ে তৃপ্তি লাভ করতো, কিন্তু……

বল, থামলে কেন? ওগো বলো কে সে নররাক্ষস যার এত সাহস তোমার বুক চিরে কলিজা আর হৃৎপিন্ড খেয়ে তৃপ্তি লাভ করতে চায়?

আমি তাকে হত্যা করেছি।

তুমি তাকে হত্যা করেছো?

হাঁ, সেই নররাক্ষসকে আমি হত্যা করেছি……

নররাক্ষস

হ, মনিরা সে এক ভীষণ শক্তিশালী ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। আমি তার কাছে পরাজয় বরণ করতে গিয়ে বেঁচে এসেছি। এই দেখো……বনহুর বুকের জামা খুলে ধরে।

মনিরা আর্তনাদ করে চোখ ঢেকে ফেলে।

বনহুর মৃদু হাসে, তারপর এগিয়ে এসে মনিরার চোখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বলে–যে অস্ত্র দ্বারা সেই নররাক্ষস শত শত মানুষের বুক চিরে কলিজা আর হৃৎপিন্ড খেয়েছে, এ ক্ষত তারই সামান্য চিহ্ন।

মনিরা ভাল করে তাকিয়ে দেখলো, জামার তলে বিরাট একটা লম্বা ক্ষতচিহ্ন। যদিও ক্ষত দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে না, তবু ক্ষতটার গভীরতা লক্ষ করে শিউরে উঠলো সে। বললো–উঃ কি ভয়ঙ্কর! তবু তুমি দাঁড়িয়ে আছো……কথাটা বলে সে হাত থেকে রিভলভারটা বিছানার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীর জামার অংশ চেপে ধরে বললো–একি সর্বনাশ করেছে তুমি?

ও কিছু না মনিরা! এই যেমন তোমার রিভলভারের গুলীতে মরতে গিয়ে বেঁচে গেলাম। মরতে ভয় নেই, যদি তোমার হাতে মৃত্যু হয়, সে হবে মধুর।

এখন ওসব কথা রাখো, এসো বিছানায় শুয়ে পড়ো দেখি। মনিরা স্বামীকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে আঁচলে পানিতে ভিজিয়ে জমাট রক্তগুলো মুছে দিতে থাকে।

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে–সত্যি মনিরা, একটা ভীষণ বিপদ কাটিয়ে উঠেছি। সাংঘাতিক, ভয়ঙ্কর ঐ নররাক্ষসটা।

নররাক্ষস সে কি রকম?

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা মানুষ, সে লোকালয়ে বাস করে কিন্তু মানুষের কলিজা আর হৃৎপিন্ড খেয়ে জীবন ধারণ করে। লোকে জানে সে তাদের মত একজন…….

সাংঘাতিক মানুষ তো তাহলে সে!

হাঁ, একজন ভদ্রবেশী নররাক্ষস।

যাক, সব পরে শুনবো। এখন তুমি চুপ করে শোও দেখি। মনিরা স্বামীর চুলে হাত বুলিয়ে কথাগুলো বললো, তারপর ওষুধ এনে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলো।

মনিরা বলে–তুমি কেন গিয়েছিলে বলো তো?

আমার উদ্দেশ্য ছিলো নররাক্ষস মিঃ নোমান সত্যি নরঘাতক কিনা যাচাই করে দেখা এবং তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা, কিন্তু সে সুযোগ আমার হয়নি.......মনিরা, আগে এক গেলাস পানি দাও, আমি সব বলছি।

মনিরা তাড়াতাড়ি পানি আনতে চলে গেলো।

বনহুর বিছানায় দেহটা ভালভাবে এলিয়ে দিলো।

একটু পরে এক গেলাস ঠান্ডা পানি নিয়ে ফিরে এলো মনিরা। বনহুর মনিরাকে দেখে মাথাটা উঁচু। করে মুখটা বাড়িয়ে ধরলো। মনিরা বাম হাতে বনহুরের মাথাটা ধরে ডান হাতে পানির গেলাসটা তার মুখে ধরলো।

এক নিঃশ্বাসে পানি পান করে আবার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো বনহুর।

মনিরা পাশে বসে স্বামীর বুকের ক্ষতস্থানে ওষুধের প্রলেপ লাগাতে লাগলো।

বনহুর সমস্ত ঘটনাটা মনিরাকে সংক্ষেপে বলে বললো—আমি মিঃ নোমানের গাড়ি নিয়ে সোজা চলে এসেছি এখানে। কেউ আমাকে সন্দেহ করেনি। তবে এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যার জন্য তোমার পাশে পৌঁছেও তোমাকে জাগাতে পারিনি।

অভিমানের সুরে বললো মনিরা–তবু ভাল আমার পাশে এসেছো, নিশ্চয়ই নূরী জানতে পারলে তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

ছিঃ মনিরা, তুমি এত করেও নূরীকে চিনতে পারেনি। সে তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। জানো সে তোমার জন্য সব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। আমি তোমার পাশে এসেছি শুনে খুশিই হবে সে।

স্বামীর কথায় মনিরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে না। যদিও সে কিছুদিন পূর্বে নুরীর সঙ্গে একত্রিত হতে পেরেছিলো। নূরীর সঙ্গে কয়েকদিন তার মন্দ কাটেনি।

নূরী তাকে অনেক কথাই বলেছিলো। স্বল্পশিক্ষিতা নূরী মনিরার কাছে প্রাণ খুলে জানিয়েছিলো তার অন্তরের সব কথা। বনহুর তাকে বিয়েই করতে চায়নি প্রথমে। তার ভালবাসাকে সব সময় সে উপেক্ষা করে চলতো, এড়িয়ে চলতো তাকে। কিন্তু নূরী বনহুরকে সব সময় কামনা করে এসেছে, ওকে পাবার জন্য সে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো তবু বনহুর তাকে আমল দেয়নি। বনহুরের জন্য নূরী নিজের দেহের রক্ত দিয়েছে একবার নয়, দু'তিনবার। তবু বনহুর নুরীকে কোনোদিন গ্রহণ করতে চায়নি। বনহুর ভালবাসতো একমাত্র মনিরাকে। মনিরাকে পাবার জন্য বনহুর যখন উতলা তখন নূরী বনহুরকে পাবার জন্য উন্মুখ। বনহুকে রক্ষা করতে গিয়ে কতবার নূরী মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করেছে। তবু বনহুর তাকে চায়নি বা প্রেম–ভালবাসা দেয়নি। রহমান যদি বনহুরকে কঠিনভাবে ধরে না বসতো তাহলে হয়তো কোনোদিন নূরী বনহুরকে পেতো না…

কি ভাবছো মনিরা

সম্বিৎ ফিরে পায় মনিরা, বলে কিছু না।

মনিরা, তুমি আবার কবে যাবে আমার আস্তানায়, বলো?

ওখানে আমি আর যাবো না।

কেন?

ওখানে গেলে তোমার অসুবিধা হবে।

অসুবিধা হবে তুমি গেলে?

নুরী আর তোমার…….

ছিঃ ও কথা ভেবো না। আবার তোমার সেই অভিমান? নূরীকে তুমি মেনে নাও মনিরা–ও বড় অসহায়।

আর আমি বুঝি খুব সুখে–শান্তিতে আছি।

মা তোমার পাশে আছেন, তা ছাড়া সরকার সাহেব আছেন। নূর কিছুদিন পর ফিরে আসবে, আর…….

চুপ করো। আমার চেয়ে বেশি সুখী নুরী, কারণ তুমি তার পাশে থাকো।

এবার বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, তারপর হাসি বন্ধ করে বললো–সূরীরও ঐ অভিযোগ, আমি নাকি সর্বক্ষণ তোমার পাশে কাটাই। মনিরা, তোমরা কি জানো না আমি শান্ত পর্বতের মত স্থির নই। যেমন তোমার পাশে আসি তেমনি নুরীর কাছে যাই। আমার মনপ্রাণ যে সব সময় বাইরের আকুল আহ্বানে উন্মুখ হয়ে থাকে। আমি যে কোনো সময় নিজকে ধরে রাখতে পারি না মনিরা।

যাক, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, তুমি যখন এসেছে তখন চুপ করে একটু ঘুমাও দেখি।

কিন্তু, যদি ভোর হয়ে যায়?

না না, তোমাকে আমি এ অবস্থায় ছেড়ে দেবো না।

যদি পুলিশ জানতে পারে?

আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখবো। ওগো, যে সুড়ঙ্গপথ তুমি তোমার আস্তানা থেকে চৌধুরীবাড়ির অভ্যন্তরের দিকে এগিয়ে এনেছিলে তা কি শেষ হয়নি?

না মনিরা, এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। সুড়ঙ্গপথের কাজ শেষ হলে আমি যখন খুশি তোমার পাশে আসতে পারবো, তখন কোনো বাধা থাকবে না আর।

কিন্তু সেদিনে কবে আসবে কে জানে!

এদিকে ভোর হয়ে আসে।

মরিয়ম বেগম ভোরের আজানধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেন, ওজু বানাবার জন্য শয্যা ত্যাগ করতেই কানে ভেসে আসে সন্তানের কণ্ঠস্বর, উঃ মা গো মা.....

মরিয়ম বেগম কান পাতেন, বুকটা তার ধক করে উঠলো, এ যে তার মনিরের কণ্ঠস্বর! আলগোছে এগিয়ে গেলেন মনিরার কক্ষের দিকে।

পর্দা সরিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতেই মনিরা বললো–মামীমা, ও এসেছে।

আমার মনি এসেছে?

হা মামীমা, কিন্তু.......

কিন্তু কি বলো? বলো বৌমা একি......মনিরা, তোর একি চেহারা হয়েছে বাবা?

মরিয়ম বেগম সন্তানের চিবুকে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন–কি হয়েছে বল, ওরে বল?

বনহুর একটু হেসে বললো–মিছেমিছি ব্যস্ত হচ্ছো মা, সামান্য ক্ষত ছাড়া কিছু নয়।

মনিরা বললো–আমি তোমাকে ডাকবো বলছিলাম কিন্তু তুমি ব্যস্ত হবে বলে ও আমাকে ডাকতে দেয়নি।

সর্বনাশ হয়েছে, এমনভাবে কে তোকে আহত করেছে বাবা?

বললাম তো সামান্য ক্ষত.....

এটা সামান্য ক্ষত? আমাকে তুই শিশুভোলান ভোলাতে চাচ্ছি? বৌমা, শিগগির ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

মা, তবু কিছুক্ষণ থাকতে পারতাম কিন্তু তুমি তাও দিলে না। আমাকে তাহলে এক্ষুণি যেতে হয়....

বাবা মনির।

হাঁ মা, তুমি তো জানো তবু কেন বুঝতে চাওনা? যাও নামায পড়োগে–আমি এমনিতেই সেরে উঠবো।

কিন্তু তোর কি হয়েছে বলবি না বাবা?

সব জানতে পারবে।

মরিয়ম বেগম আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে নামাযের জন্য বেরিয়ে যান।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে, চিবুকটা উঁচু করে ধরে বলে–মাকে তুমি কিছু বলল না মনিরা। যা হয় আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো। জানো তো মা কত ব্যস্ত

হয়ে পড়েছেন, কত ভাবেন তিনি।

তা যদি বুঝতে তাহলে এখনও তুমি নিজেকে সংযত করতে, এমন অপকর্ম করে আর বেড়াতে না।

অপকর্ম?

অপকর্ম?

নয় তো কি? যা তুমি করে বেড়াও তা কোনো মানুষের জন্য শ্রেয় নয়।

বনহুর নিজের মাথাটা তুলে দেয় মনিরার কোলে, তারপর ওর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠায় চেপে ধরে বলে–আমি যা করি সব অপকর্ম মনিরা! বনহুর উঠে বসে এবার।

হ্যাঁ, আমার কাছে তাই মনে হয়! গম্ভীর কণ্ঠে বললো মনিরা।

বনহুর কিছুক্ষণ নীরবে ভাবলো, তারপর ব্যথাভরা কণ্ঠে বললোমনিরা, তুমি যদি আমাকে অপকর্ম করি বলে অভিশাপ দাও, তাহলে কে আমাকে ভরসা দেবে বলো?

তুমি যা করো, আমি কেন কেউ কি তা পছন্দ করে বলো? কি কাজ ছিলো তোমার যার জন্য তুমি গিয়েছিলে নররাক্ষসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে।

একটু হেসে বললো বনহুর–মনিরা, তুমি কি চাও আমাদের দেশের মানুষ নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করুক? নিশ্চয়ই তুমি চাও না একটা মানুষ সবগুলো মানুষের শান্তি হরণ করুক? নিশ্চয়ই তুমি তা চাও না এবং আমি সেই কারণেই গিয়েছিলাম সেই নরখাদককে শায়েস্তা করতে।

এতে যদি তোমার মৃত্যু ঘটতো?

কোনো দুঃখ ছিলো না।

তোমার মৃত্যু তোমাকে দুঃখ দেবে না, যত দুঃখ যত ব্যথা ভোগ করবো আমরা। তুমি নিষ্ঠুর, তাই তুমি অমন কথা বললা……মনিরার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

বনহুর মনিরাকে গভীর আবেগে টেনে নেয় কাছে।

মনিরা বলে উঠলো–ছিঃ দুষ্টমি গেলোনা তোমার! মামীমা এক্ষুণি এসে পড়বেন।

বনহুর আরও বেশি করে আকর্ষণ করে, আরও কাছে টেনে নেয় ওকে।

মনিরা আর ওকে বাধা দেয় না, অনাবিল আনন্দে ভরে উঠে ওর মন। স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুতে নিজকে বিলিয়ে দেয় সে।

*

বেশ কয়েক দিন কেটে গেলো।

মনিরা বনহুরকে ছেড়ে দেয়নি, অত্যন্ত সাবধানে লুকিয়ে রাখলো সে নিজের কক্ষে। সদাসর্বদা স্বামীর পাশে থেকে সেবাযত্ন করতে লাগলো। এতটুকু অসাবধান হলে যদি কেউ জেনে ফেলে, পুলিশকে জানিয়ে দেয় তাহলে সর্বনাশ হবে। বাড়ির সবাই সতর্ক, এমন কি পুরোন ঝি–চাকর সবাই বিশ্বাসী, তারাও কাউকে কিছু জানাবে না, জানতো মনিরা। তবু সতর্কতার অন্ত নেই। ঘরে যেন অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে মনিরা, কাউকে সে ঐ ঘরে প্রবেশ করতে দেয় না একমাত্র মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব ছাড়া।

তবে চাকরবাকর সবাই জানে, ছোট সাহেব আহত অবস্থায় বৌরাণীর কক্ষে রয়েছেন। তারাও সব সময় সচেতন, কেউ যেনো কোনো রকম কথা কাউকে না বলে।

সরকার সাহেব নিজে ওষুধ আনেন এবং বনহুরকে ঠিকমত খাওয়ান আর ক্ষতস্থানে লাগান।

স্বামীকে পাশে পেয়ে উচ্ছল আনন্দে আত্নহারা মনিরা। চুলে হাত বুলিয়ে সে স্বামীকে ঘুম পাড়ায়। ঘুম ভাঙলে নিজের হাতে চা–নাস্তা খাওয়ায়। নিজের হাতে পরিয়ে দেয় জামাকাপড়। কত খুশি, কত আনন্দ মনিরা...স্বামীর মধ্যে নিজকে সে বিলীন করে দিয়েছে।

এখন অনেকটা সুস্থ বনহুর।

মাঝে একবার রহমান এসে সর্দারের সন্ধান নিয়ে গেছে। সর্দার যে আহত অবস্থায় চৌধুরীবাড়িতে আছে সে তা জানতো না। তবে তার ধারণা ছিলো সর্দার সেখানেই আছে এবং সে কারণে রহমান ছদ্মবেশে এসে সংবাদ নিয়ে গেছে।

নূরী বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো, না জানি বনহুর কোথায় গেলো! কেমন আছে কিছু জানে না, তাই সে উতলা হয়েছে।

রহমান জানতে পেরেছে, সর্দার নিজে নররাক্ষস নোমানকে পর্বতমালার উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে এবং নিজেও বেশ আহত হয়েছেন কিন্তু তিনি কোথায় গেলেন তার সন্ধান পায়নি।

নূরী এবং নাসরিনের উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করে রহমান চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো আর সেইজন্যই সে প্রথমে গোপনে সন্ধান নিয়েছে চৌধুরীবাড়িতে। যখন রহমান জানতে পারলো সর্দার সেখানেই আছেন তখন সে গোপনে সাক্ষাৎ করলো তার সঙ্গে।

রহমান ছদ্মবেশে আসায় কেউ জানতে পারলো না তার আগমনবার্তা। গোপনে যেমন এসেছিলো তেমনি সে চলে গেলো সবার অলক্ষ্যে। দিপালী সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগলেও সে সর্দারকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলো না। রহমান অবশ্য ইচ্ছা করেই দিপালী সম্বন্ধে কোনো কথা বললো না, কারণ সে দেখলো সর্দার ভয়ানক অসুস্থ। তার দেহের কয়েক স্থানে বেশ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে সর্দারের বুকের ক্ষতটা ভালো না হওয়া পর্যন্ত তাকে সে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না মনস্থ করলো।

অবশ্য বনহুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলো দিপালী সম্বন্ধে। রহমান তার সম্বন্ধে কিছু জানে না বলে জানিয়েছিলো। আসলে রহমানও জানত না দিপালী গ্রেপ্তার হয়েছে।

সেদিন বনহুর সবে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো কিন্তু, হয়তো বা মনিরার কথা, নয়তো নূরী সম্বন্ধে কিংবা তার দুস্থ অসহায় বন্ধুদের কথা, এমন সময় রহমান এসে হাজির হলো।

সোজা সে সরকার সাহেবের সহায়তায় মনিরার কক্ষে এলো।

সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–সর্দার, দিপালী বন্দী হয়েছে।

বলল কি রহমান!

হ্যাঁ সর্দার।

কি করে জানলে?

সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা করে চলে যাই, তারপর সন্ধান নিয়ে জানতে পারি দিপালী তখনও ফিরে আসেনি। পরে আমি ভালভাবে সংবাদ নিয়ে জানি দিপালী গ্রেপ্তার হয়েছে।

দিপালীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে?

হা সরদার।

ঠিক ঐ মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা, সে দরজার উপরে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় সব কথা।

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করতেই রহমান তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

মনিরা গম্ভীর মুখে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর বলে সে–দিপালী…কে সে দিপালী?

বনহুর বুঝতে পারলো মনিরা ক্রুদ্ধ হয়েছে। মিঃ নোমানের সম্বন্ধে যখন বলছিলো বনহুর তখন দিপালীর কথা সে ইচ্ছা করেই সম্পূর্ণ বাদ রেখে বলেছিলো। কারণ তেমন বলবার কিছু ছিলো না দিপালী সম্বন্ধে। বললো বনহুর– দিপালী এক অসহায় মেয়ে, অবশ্য তার সম্বন্ধে একদিন তোমাকে বলেওছিলাম, হয়তোবা খেয়াল নেই তোমার।

দিপালী তোমার সহকারী না সহচরী, জানতে পারি কি?

দুটোর একটাও নয়, বলতে পারো সে আমাদের একজন হিতাকাঙ্খিনী

তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ শুনি?

সম্বন্ধ কিছুই না।

তবে কেন সে তোমার সঙ্গে থাকে বা সহায়তা করে।

থাকে না, সহায়তা করে সে আমার কাজে। মনিরা, তুমি মিছামিছি রাগ করছে, দিপালী সত্যি বড় অসহায়, তাই......

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা–তাই তাকে তোমার আস্তানায় স্থান দিয়েছেঃ ছিঃ ছিঃ আমি জানতাম তুমি দেবপুরুষ, কিন্তু......

মনিরা, আমি ভাবতে পারি না তুমি কি করে এমন চিন্তা মনে স্থান দিলেঃ মনিরা, দিপালী কে এবং তার সঙ্গে আমার কি বা কেমন আচরণ, এ কথা তোমাকে আরও একবার বলেছিলাম। তুমি তা স্মরণ রাখোনি, তাই আজ এভাবে বলতে পারছে। মনিরা, দিপালী আমার শহরের আস্তানায় থাকে এবং সে গোপনে শহরের বিভিন্ন স্থানে যে অন্যায় অনাচার বা দুস্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্য চলেছে, তার সন্ধান জানায়.......তুমি বিশ্বাস করো, সে মহৎ মহিলা।

তোমার কাছে সবাই মহৎ মহান......

আর আমি নিজে অসৎ, এই তো?

হাঁ, তাই তুমি।

বেশ, তাই হোক, তুমি যা বলছে বা ভাবছো তাই আমি। কিন্তু একটা কথা মনিরা, আমাকে তুমি কখনও অবিশ্বাস করোনা! বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগম সন্তানের জন্য নাস্তা তৈরি করে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসেছেন। কদিন হলো তিনি সন্তানকে পাশে পেয়ে কি যে আনন্দ উপভোগ করছেন তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। মনের খুশি ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। বাবুর্চির হাতে তিনি রান্না ছেড়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছেন না, তাই নিজ হাতে সন্তানের জন্য নাস্তা তৈরি করে বসে আছেন প্রতিদিনের মতো।

বনহুর স্নানাগারে প্রবেশ করলো, তারপর গোসল শেষে করে ফিরে এলো বেড রুমে মনিরা স্বামীর প্রতীক্ষায় ছিলো।

ফিরে আসতেই জামাকাপড় এগিয়ে দিলো–নাও পরো।

বনহুর জামাকাপড় পরে নিলে মনিরা নিজের হাতে তার চুলগুলো আঁচড়ে দিলো যত্ন সহকারে।

হেসে বললো বনহুর–মনিরা, মাঝে মাঝে তোমাকে খুব দূরে মনে হয়......

তার মানে?

মানে মনে হয় তুমি ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আর কখনও মনে হয় আমি তোমার কাছের মানুষ?

হা! এই যেমন এখন! বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় হাতখানা ধরে।

বলে মনিরা–ছিঃ ছাড়ো! ছাড়ো বলছি!

না!

মা বসে আছেন তোমার নাস্তা নিয়ে।

আচ্ছা চলো! উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

মনিরা আর বনহুর নাস্তার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো।

মরিয়ম বেগম নিজের হাতে নাস্তার প্লেটগুলো গুছিয়ে দিতে লাগলেন, মুখে তার মিষ্টিমধুর হাসির আভাস লেগে আছে।

বনহুর বললো–মা, আমি লক্ষ্য করছি তুমি রোজ নিজে রান্নাঘরে গিয়ে এসব তৈরি করো! কিন্তু কেন মা তুমি এসব করতে যাও? জানো তো আমি সব রকম জিনিস খেতে পারি।

জানি, আমি সব জানি। কিন্তু তুই জানিস না নিজ হাতে রান্নাবান্না করে সন্তান–সন্ততিদের খাওয়ানোর কত আনন্দ! তোকে আমি নিজে রান্না করে খাওয়াতে পারছি, এতে আমার মনে কি যে আনন্দ হচ্ছে তা তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। নে বস্ বাবা!

বনহুর বসে পড়লো।

মরিয়ম বেগম বললেন–বৌমা, তুমি বসো।

না মামীমা, পরে খাবোক্ষণ।

না, তুমি আর মনির একসঙ্গে খাও, আমি পরিবেশন করছি।

তা হয় না মামীমা, তুমি তোমার সন্তানের পাশে বসে খাও, আমি পরিবেশন করবো।

বনহুর বললো–সব গোছানো আছে মা, তুমি ও মনিরা বসো। একসঙ্গে আমরা তিনজন নাস্তা করবো।

তিনজন একসঙ্গে নাস্তা করতে বসলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সরকার সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালেন তাদের পাশে, কিছু বলতে গেলেন কিন্তু বলতে পারলেন না।

বনহুর সবেমাত্র নাস্তা মুখে দেবে, সেই মুহূর্তে সরকার সাহেব এলেন এবং তার অবস্থা দেখে বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন–কি হয়েছে সরকার চাচা?

পুলিশ.......বাবা, পুলিশ বাহিনী কি করে যেন টের পেয়ে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে।

মরিয়ম বেগম আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ালেন।

মনিরার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

বনহুর গেলাস থেকে একটু পানি মুখে দিয়ে বললো–মা, কিছু ভেব না, আবার আসবো......কথাটা বলে দোতলার রেলিং টপকে ওপাশে চলে গেলো বনহুর।

এদিকে সিঁড়িতে তখন ভারী বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মরিয়ম বেগম নাস্তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

মনিরা পাথরের মূর্তির মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

অল্পক্ষণে পুলিশ ইন্সপেক্টার দলবলসহ এসে দাঁড়ালেন নাস্তার টেবিলের পাশে। তাদের সবার হাতে গুলীভরা রিভলভার।

ইন্সপেক্টার বললেনবনহুর কোথায়? বলুন বনহুর কোথায়?

মরিয়ম বেগম আঁচলে চোখ মুছে বললেন কি অন্যায় সে করেছে যার জন্য আপনারা তাকে এখানে খুঁজতে এসেছেন?

তার জবাব পরে পাবেন, এখন বলুন সে কোথায়?

মরিয়ম বেগম বললেন—আমি বলবো না!

ইন্সপেক্টার মরিয়ম বেগমের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কঠিন গলায় কিছু বলতে গেলেন।

মনিরা বললো–উনি কিছু জানেন না, জানি আমি।

ইন্সপেক্টার এবার ফিরে এলেন মনিরার কাছে, সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন–বলুন সে কোথায়?

মনিরা তাকালো সিঁড়ির দিকে, তারপর বললো–এ বাড়িতেই সে ছিলো এই জানি, আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন।

ইন্সপেক্টার দলবলকে বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও তল্লাশি চালালেন।

সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালালেন কিন্তু কোথাও বনহুরকে পেলেন না।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বাইরে শোনা গেলো রাইফেল এবং রিভলভারের গুলীর শব্দ।

মরিয়ম বেগম এবং মনিরার বুকটা ধক করে উঠলো।

মরিয়ম বেগম কেঁদে উঠলেন।

মনিরা ছুটলো ওপাশের রেলিংয়ের ধারে, সে ঝুঁকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। শুধু দেখলো একটা বিরাট আর নীল রঙের গাড়ি পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো আর সেই গাড়িখানাকে ফলো করে ছুটছে পুলিশ ভ্যানগুলো।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ নিঃশ্বাসে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো মনিরা, তারপর ফিরে দাঁড়াতেই দেখলো সরকার সাহেব সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উপরে উঠে আসছেন।

পুলিশ এসেছে সংবাদটা উপরে পৌঁছে দিয়েই সরকার সাহেব তখন নিচে নেমে গিয়েছিলেন। পুলিশ যখন বাড়িখানা তল্লাশি চালায় তখন তিনি নিচেই ছিলেন। মনিরা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে ছুটে আসে সরকার চাচা, কোথায়?

সরকার সাহেব ততক্ষণে এসে পৌঁছে গেছেন দ্বিতলের বারান্দায়, মনিরার কথায় জবাব দিলেন তিনি–ছোট সাহেবকে কেউ ধরতে পারবে না মা, আল্লাহ তার সহায়।

সরকার চাচা!

হা মা, ছোট সাহোব পুলিশ বেষ্টনী পেরিয়ে তার সেই নীল রঙের গাড়িখানায় চেপে বসতেই পুলিশ। বাহিনী ছুটে এলো চারদিক থেকে কিন্তু ততক্ষণে ছোট সাহেব গাড়ি নিয়ে অন্তর্ধান হয়েছে।

সরকার চাচা, দোয়া করুন সে যেন নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

সরকার সাহেব বললেন–মা, কিছু ভেবো না, খোদা যার সহায় কোনো শক্তিই তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

আপনার কথা যেন ঠিক হয় সরকার চাচা।

*

বনহুর গাড়িতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা উদ্ধাবেগে ছুটতে লাগলো।

পিছনে তিনখানা পুলিশ ভ্যান ছুটছে।

পরপর গুলী নির্গত হচ্ছে পুলিশ ভ্যান থেকে। গুলীর ধোঁয়ায় মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছে সম্মুখের গাড়িখানা।

রাজপথ অতিক্রম করে বনহুরের গাড়ি এলোপাতাড়ি পথ ধরে ছুটছে। নির্জন পথে গাড়িখানা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড আরও তিনগুণ বেড়ে গেলো। পুলিশ ভ্যানগুলো কিছুতেই নাগালের মধ্যে আনতে পারছে না বনহুরর গাড়িখানাকে। পুলিশ বাহিনী গুলীর পর গুলী ছুড়ছে।

যতক্ষণ শহরের পথ ধরে গাড়ি ছুটছিলো ততক্ষণ পথের দু'পাশে লোকগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো, তারা সহসা কিছু ভেবে পাচ্ছিলো না।

এখন নির্জন পথে কোনো বাধা নেই, সম্মুখে সীমাহীন প্রান্তর। পুলিশ ভ্যানগুলো বারবার চেষ্টা নিচ্ছিলো বনহুরের গাড়িখানার সম্মুখভাগে গিয়ে গাড়িখানার গতি রোধ করবে এবং বনহুরকে জীবন্ত অবস্থায় পাকড়াও করবে।

কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করেও সফল হলো না পুলিশ বাহিনী।

বনহুরের গাড়িখানা এবার ফিরু পাহাড়ের দিকে এগুলো। কান্দাই ছেড়ে বহুদূরে এই ফিরু পাহাড়। সকালে নাস্তার টেবিল থেকে উঠে এসেছে বনহুর আর এখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। কান্দাই শহর ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে তারা।

পুলিশ ভ্যানগুলো এতক্ষণ ঠিকভাবে বনহুরের গাড়িখানাকে ফলো করে আসছিলো।

মাঝপথে একটা গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় দুটো পুলিশ ভ্যান এগুচ্ছিলো, এবার আর একটা বিকল হয়ে পড়লো।

একটা পুলিশ ভ্যানে যতগুলো পুলিশ ধরে, তাই নিয়ে একটা গাড়ি বনহুরের গাড়িখানাকে অনুসরণ করছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে আসছে। পুলিশ ভ্যানটার গতি ক্রমে যেন হ্রাস পাচ্ছে। এলোপাতাড়ি পাথুরিয়া পথ।

বনহুর দক্ষ ড্রাইভার, একনাগাড়ে এতো পথ চলেও ক্লান্তি আসেনি তার। অথচ পুলিশ বাহিনী সেই সকাল থেকে এখন পর্যন্ত মুখে দানাপানি না দিয়ে টিকে

ছিলো। কিন্তু আর পারছে না, তারা রাইফেল উঁচু করে ধরে রাখতে পারছে না আর, হাত দু'খানা তাদের অবশ হয়ে আসছে।

পুলিশ বাহিনী পুলিশ প্রধানের অনুমতি না পেলে গাড়ি রুখতে পারছে না। ওদিকে বনহুরের গাড়িখানা অন্তর্ধান হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটামাত্র পুলিশ ভ্যান প্রাণপণে বনহুরের গাড়িখানাকে অনুসরণ করে এতটা পথ এসেছে।

পুলিশ বাহিনী প্রধান কঠিন দুর্ধর্ষ মানুষ, জীবনে তিনি বহু ডাক গ্রেপ্তার করেছেন। কান্দাই আসার পর থেকে তার বাসনা বনহুরকে গ্রেপ্তার করেন।

সে সুযোগ তার এসেছে। তিনি প্রাণ দিয়েও এই সুযোগ গ্রহণ করতে চান।

কিন্তু এবার তিনি হতাশ হয়ে পড়ছেন। যদিও এতক্ষণ তার মনোবল ছিলো অনেক। যখন একটা ভ্যান বিকল হলো তখন তিনি ভিতরে ভিতরে কিছুটা হতাশ হলেও মুখোভাবে তা প্রকাশ করেন নি। তারপর যখন দ্বিতীয় ভ্যান নষ্ট হয়ে পড়লো তখন পুলিশ বাহিনী প্রধান আরও কিছুটা দমে গেলেন। পাশে বসা ইন্সপেক্টারকে বললেন–না জানি ভাগ্যে কি আছে, দু'খানা গাড়ি গেলো!

ইন্সপেক্টার বললেন–এসেছি যখন তখন শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালাবো আমরা।

পুলিশ বাহিনী প্রধান বললেন–সাবাস, আমি আপনার মুখে এমনি কথা শুনবো আশা করেছিলাম। আমরা শেষ পর্যন্ত দেশে নিতে চাই বনহুরকে। গ্রেপ্তার আমরা তাকে করবোই।

কিন্তু বললে কি হবে, আর কিছুটা এগুনের পর পাহাড়টা পথ রোধ করে ফেললো। আর এগুনো সম্ভব নয়, তাছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকর হয়ে এসেছে।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

পিছনে পুলিশ ভ্যানখানা এখও বেশ দূরে। মাঝে মাঝে গুলী নিক্ষিপ্ত হচ্ছে পুলিশ ভ্যান থেকে।

বনহুর গাড়ি রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। আগাছা আর ঝোঁপ–ঝাড় ভরা পাহাড়টার উপরিভাগ। সন্ধ্যার অন্ধকারে আর তাকে পুলিশ

বাহিনী দেখতে পাচ্ছে না। তবু পুলিশ বাহিনী গুলী ছুড়ছে পাহাড় লক্ষ্য করে।

পুলিশ বাহিনী গাড়িখানার পাশে এসে পড়েছে এবং তারা গাড়ি শূন্য দেখেই বুঝতে পেরেছে শিকার অন্তর্ধান হয়েছে।

পুলিশ বাহিনী একেবারে দমে গেলো। একে দুটো ভ্যান নষ্ট হয়ে গেছে, তদুপরি নির্জন পাহাড়ের পাদমূলে যে কোনো ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। পুলিশ বাহিনী তবু ভীত না হয়ে পর পর গুলী ছুঁড়তে লাগল।

বনহুর ততক্ষণে অনেক উপরে উঠে গেছে।

তবু দু'একটা গুলী তার আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বিদ্যুতের ঝলকানির মত রাইফেল থেকে বারুদের আগুন লক্ষ্য করলো এবং বুঝতে পারলো পুলিশ বাহিনী এখনও তার রেখে আসা গাড়িখানার পাশে অপেক্ষা করছে।

বনহুর অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করছে।

কয়েকদিন পূর্বে তার শরীর থেকে বহু রক্তপাত হয়েছে। দেহ ক্লান্ত শিথিল মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন এক জায়গা থাকে খুঁজে নিতে হবে যেখানে সে রাতের মত নিরাপদ কাটাতে পারে।

আরও উপরে উঠছে বনহুর।

সে এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, কারণ নাস্তার টেবিল থেকে তাকে চলে আসতে হয়েছে। রিভলভার, পিস্তল ছোরা কিছু তার সঙ্গে নেই। হঠাৎ কোনো হিংস্র জীবজন্তু হানা দিলে নিজকে রক্ষা করবার কোনো পথ নেই তার।

বনহুরের কানে ভেসে এলো গাড়ির হর্ণের শব্দ, তার সঙ্গে হুইসেলের আওয়াজ। রাতের নিকষ অন্ধকারে শব্দটা যেন তীব্র হয়ে বেজে উঠলো ফিরু পাহাড়ের গায়ে!

বনহুর লক্ষ্য করলো, পুলিশ ভ্যান ছাড়াও আরেকটা গাড়ি পাহাড়ের পাদমূলে আলো ছড়িয়ে ফিরে চলেছে। অবশ্য বনহুর বুঝতে পারলো দ্বিতীয় গাড়িখানা

তার সেই নীল রঙের গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি নয়। আর সেই গাড়ি ছাড়া দু'খানা গাড়ি পুলিশ বাহিনী পাবেই বা কোথায়।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই বনহুরের। একে অজানা জায়গা, তদুপরি রাতের অন্ধকার। নানা রকম বিপদের সম্ভাবনা আছে। আশেপাশে তেমন কোনো জায়গা নেই যেখানে রাতের মত আশ্রয় নেবে।

ক্রমান্বয়ে গাড়ির সার্চলাইটের আলো পাহাড়ের পাদমূল ছেড়ে দূরে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। বুঝতে পারলো বনহুর পুলিশ বাহিনী তাকে না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

এবার বনহুর নিশ্চুপ মনে বসলো।

রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছিলো সে, খুব ক্লান্তি লাগছে তার। মাথাটা বেশ ঝিমঝিম করছে।

হিমেল হাওয়া বইছে।

সমস্ত শরীর জড়িয়ে এলো বনহুরের, তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই তার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা আর্তনাদের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো তার। ধড়মড় করে চোখ রগড়ে উঠে বসলো, চারদিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু।

বনহুর বুঝতে পারলো ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় সে এমন গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো যে, রাতটা কোন দিক দিয়ে কেটে গেছে খেয়ালই হয়নি। কোনো হিংস্র জীবজন্তু তাকে ঘুমের ঘোরে আক্রমণ করলে মৃত্যুর হতোই কিন্তু খোদা তাকে রক্ষা করেছেন।

বনহুর অল্প সময় ভেবে নিলো কথাটা, পুনরায় সেই আর্তনাদের শব্দ। সজাগ হয়ে উঠলো বনহুর, ভুলে গেলে ক্ষুধা–পিপাসার কথা। উঠে দাঁড়াতেই পাহাড়ের পাদমূলে লক্ষ্য পড়লো তার। দু'জন বলিষ্ঠ পুরুষ একটা তরুণীকে টেনে–হিঁচড়ে নিয়ে আসছে।

তরুণী চিৎকার করছে, বাঁচাও বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে……

কিন্তু কে সেই তরুণীর চিৎকার শুনবে, নির্জন পাহাড়ের পাদমূলে কেউ নেই যে, তাকে উদ্ধার করে।

বনহুর নিজের ক্ষুধা–পিপাসার কথা ভুলে গেলো, সে দ্রুত পাহাড় থেকে নামতে লাগলো যেমন করে হোক ঐ অসহায় তরুণীকে উদ্ধার করতেই হবে। কে ঐ তরুণী আর কারাই বা ওরা?

পাহাড়ের অনেক উপরে উঠে গিয়েছিলো বনহুর, নামতে তাই বিলম্ব হলো।

বনহুর যখন নেমে আসছে তখন গুস্তাদ্বয় তরুণীটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে।

বনহুর নামছে।

তরুণীটা তখনও চিৎকার করে যাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও…..

বনহুর নেমে আসে এবং লাফ দিয়ে পড়ে ঐ দুজন বলিষ্ঠকায় গুন্ডার মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ঘুষি লাগিয়ে দেয় শুদ্বয়ের চোখেমুখে।

কিন্তু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বনহুর, মুহূর্তে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায় অসংখ্য পুলিশ সবার হাতে গুলীভরা রাইফেল।

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থ' হয়ে দাঁড়ায়।

গুন্ডাকৃতি লোকদ্বয় হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছতে থাকে। একজনের নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। অপরজনের ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। বনহুর দুজনকেই ঘায়েল করে ফেলেছিলো এক দন্ডে।

বনহুরের চারপাশে পুলিশ বেষ্টনী।

বনহুর পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে তাকালো তরুণীটার দিকে। তরুণীর দিকে তাকাতেই কুঞ্চিত হলো বনহুর, কারণ সে দেখলো কিছু পূর্বে আত্নরক্ষার্থে যে তরুণী–চিৎকার করে বলছিলো বাঁচাও বাঁচাও……সেই তরুণী এখন ফিক ফিক

করে হাসছে। বনহুর বুঝতে পারে সব চাতুরি, তাকে গ্রেপ্তার করার বিরাট এক ফন্দি।

বনহুরের চোখেমুখে একটা ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠলো। দাঁত দিয়ে অধরদংশন করতে লাগলো সে। একে সে ক্লান্ত তারপর ক্ষুধার্ত, কদিন পূর্বে ভীষণভাবে আহত হয়েছিলো। বহু রক্তক্ষয় হয়েছে, সেজন্য দুর্বল, তবু বনহুর সিংহের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

পুলিশবাহিনী প্রধান এবং ইন্সপেক্টার দু'জন পাশে রিভলভার উদ্যত করে ধরলেন, একজন বললেন–খবরদার, একচুল নড়েছো কি মরেছে।

বনহুর বাঁকা চোখে তাকালো পুলিশ অফিসারদ্বয়ের দিকে।

পুলিশ অফিসারদ্বয়ের একজন পুলিশ বাহিনী উদ্দেশ্য করে বললেন–একে গাড়িতে উঠিয়ে নাও।

পুলিশবাহিনী রাইফেলের মুখে বনহুরকে অদূরে থেমে থাকা গাড়ির দিকে নিয়ে চললো।

অফিসারদ্বয় তরুণীটাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেদের গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন।

ভুল করে পুলিশবাহিনী কোনো হাতকড়া বা লৌহশিকল সঙ্গে আনেন নি। অবশ্য তাদের ধারণা ছিলো বনহুরকে তারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন কিনা সন্দেহ এবং সেই কারণেই তারা এসব আনেন নি। কিন্তু এত সহজে কাজ হাসিল হলো, এটা তাদের বিরাট সাফল্য বলা চলে।

পুলিশবাহিনীর আনন্দ ধরছে না, তাদের চোখেমুখে দীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। তারা বনহুরকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যজয়ের আনন্দ নিয়ে ফিরে চললো।

কিন্তু বেশিদূর এগুতে হলো না পুলিশ বাহিনীকে।

যখন পুলিশ ভ্যান দুটো পাথুরে পথে হোঁচট খেয়ে খেয়ে এগুচ্ছিলো তখন বনহুর হঠাৎ গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা ধাক্কা খেলো পাহাড়টার গায়ে।

সমস্ত পুলিশ যারা অস্ত্র উদ্যত করে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলে কেউ নিচে, কেউ গাড়ির ভিতরে।

পিছনের গাড়িখানাও ধাক্কা খেয়ে সামনের গাড়িখানার সঙ্গে। আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়লো নিচে এবং পুলিশ বাহিনী টা সামলে উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই পাহাড়টার পাশে ঝোঁপের মধ্যে সরে পড়লো।

পুলিশপ্রধান চিৎকার করে বললেন–গুলী ছোড়......গুলী ছোড়..

নিজেও তিনি গুলী ছুঁড়তে লাগলেন সম্মুখের ঝোঁপটা লক্ষ্য করে।

পুলিশ বাহিনী যারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো তারা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল থেকে অনর্গল গুলী ছুঁড়তে লাগলো।

যে এক মহাকান্ড, হঠাৎ কোথা দিয়ে কি যেন ঘটে গেলো। সবাই হতবাক। পুলিশবাহিনী সবাই কেপলক্ষ্য করে গুলী চুড়ছে আর এগুচ্ছে। সম্মুখে পুলিশ অফিসারদ্বয়।

ওদিকে বনহুর ঝোঁপটার মধ্যে উবু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। তার মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে এক একটা গুলী। না জানি কখন এসে তার দেহে বিদ্ধ হবে!

বনহুর প্রাণপণ চেষ্টায় ঝোঁপ অতিক্রম করে পাহাড়ের দিকে এগুচ্ছে।

ক্রমে পুলিশবাহিনী ঝোঁপটার কাছে এসে পড়লো।

বনহুর ভাবছে আর রক্ষা নেই; এবার পুলিশ বাহিনীকে তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলবে। তারা তাকে গ্রেপ্তার করার পর অতি সাবধানতার সঙ্গে নিয়ে যাবে শহরে। তারপর কারাগার......কিন্তু বনহুর তা হতে দেবে না, এত সহজে সে পুলিশের হাতে নিজেকে সমর্পণ করবে না......

বুক দিয়ে এগুতে লাগলো বনহুর।

ওদিকে পুলিশ বাহিনীর গুলী বৃষ্টির মত ঝরছে ঝোঁপটার উপর।

বনহুর এবার ঝোঁপ পেরিয়ে অতিকষ্টে পাহাড়টার নাগাল পায়।

ওপাশে পাহাড়ের আড়াল, উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

তার সমস্ত দেহ কাদামাটিতে একাকার হয়ে উঠেছে।

পুলিশবাহিনী তখন ঝোঁপটার মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে চলেছে। কিন্তু বনহুর কোথায়! সমস্ত ঝোঁপ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বনহুকে পাওয়া গেলো না।

এমনভাবে তারা অপদস্ত হবেন পুলিশ বাহিনী ভাবতে পারেনি। বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলো পুলিশ বাহিনী কিন্তু এ যে চরম পরাজয়! কাল সকাল থেকে বনহুরের পিছনে লেগে থাকার পর পুলিশ বাহিনী নতুন ফন্দি এঁটেছিলো। পুলিশমহল বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলো বনহুরকে কি ভাবে গ্রেপ্তার করা যায়। বনহুর ঠিক ঐ পাহাড়ের উপরেই আছে, কাজেই তাকে গ্রেপ্তার করা মুশকিল হবে না যদি নতুন কোনো বুদ্ধি বের করা যায়।

পুলিশমহলের জাদরেল অফিসারগণ জানতেন বনহুর অত্যন্ত দয়াশীল। অপরের দুঃখ–কষ্ট, ব্যথা বেদনা সে সহ্য করতে পারে না। তাই পুলিশ অধিনায়কগণ এই ফন্দি এঁটেছিলেন এবং অভিনেত্রী মিস লুনাকে নিযুক্ত করেছিলেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য। বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারলে মিস লুনাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বনহুর যখন হঠাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং অদূরস্থ ঝোঁপের মধ্যে প্রবেশ করলো তখনও মিস লুনা ভাবতে পারেনি কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো!

পুলিশ অফিসারদ্বয়ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তারা পুলিশ বাহিনীসহ ঝোঁপঝাপে তল্লাশি চালিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ঝোঁপটার অপরদিকে যেখানে পাহাড়টা বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছে হতাশ হলো পুলিশ বাহিনী এবং অফিসারদ্বয়, কারণ বনহুরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না আর। বহু ফাঁকা। আওয়াজ করলো পুলিশ ফোর্স কিন্তু কোনো ফল হলো না।

শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে চললো পুলিশ অফিসারদ্বয় এবং পুলিশবাহিনী।

মিস লুনার মুখ কালো হয়ে উঠেছে, কারণ তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। বেশী গোয়েন্দা বিভাগের লোকদ্বয়ও মুখ চুন করে ফেলেছে, তারা ভেবেছিলো বনহুরকে বন্দী করে তারা কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হবে কিন্তু সবকিছু তাদের বিফল হলো। ঝোঁপঝাড় এবং পাহাড়ের যতদূর তাদের দ্বারা সম্ভব হলো তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালালো পুলিশ বাহিনী কিন্তু কোথাও বনহুরকে খুঁজে পেলো না।

বেলা পড়েছে।

তবু তারা সন্ধান করে ফিরছে, অনুসন্ধানের যেন শেষ নেই তাদের।

বনহুর তখন একটা খুব ছোট গর্তে কুন্ডলী পাকিয়ে গুটিসুটি মেরে আত্মগোপন করে গর্তের মুখে কিছু ডালপালা আর আগাছা চাপা দিয়ে রেখেছিলো। এত ছোট গর্ত, না জানি কোন মুহূর্তে পুলিশ তাকে দেখে ফেলবে কিন্তু আশ্চর্য, পুলিশবাহিনী আশেপাশে হন্তদন্ত হয়ে সন্ধান চালিয়ে চললো অথচ সম্মুখের ছোট্ট গর্তটা তারা লক্ষ্য করলো না। কারণ তাদের বিশ্বাস, এত ছোট গর্তে একটা মানুষ কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে পারে না।

বনহুর তাকিয়ে দেখছে তার চোখের সম্মুখ দিয়ে পুলিশবাহিনীর জোয়ানরা অস্ত্র বাগিয়ে ছুটাছুটি করছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয় একবার ঐ গর্তটার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তারা নিজেরা বলাবলি করলেন, চারদিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দস্যুটা গেলো কোথায়?

অপরজন বললেন, যত সহজ আমরা মনে করেছিলাম তত সহজ নয় দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা।

প্রথমজন বললেন—পুলিশপ্রধান মিঃ জাফরী পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেছেন, তিনি বহু চেষ্টা করেও বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত আমাদের সবাইকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে?

তাছাড়া আর কত বিলম্ব করবেন?

বেলা গড়িয়ে আসছে, আর দেরী করা ঠিক হবে না। দস্যু বনহুর নতুন রূপ ধারণ করে আবার আমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারে।

সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়, চলুন এবার ফেরা যাক।

হাঁ, তাই হোক।

হুইসেল বাজালেন একজন পুলিশ অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পুলিশ যারা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিলো তারা সবাই জমায়েত হলো সেই গর্তটার পাশে।

বনহুর রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রহর গুণছে, এই বুঝি তাকে ওরা দেখে ফেলবে এবং এবার জীবিত নয়, মৃত অবস্থায় তাকে ওরা নিয়ে যাবে শহরে......কিন্তু খোদার অসীম শক্তি বা ইচ্ছা পুলিশ বাহিনী গর্তটার পাশ থেকে সরে যেতে লাগলো।

বনহুর দেখতে পেলো পুলিশ অফিসারদ্বয় এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাদের থেমে থাকা গাড়িগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

সে নিঃশ্বাস ফেলে বাচলো।

পুলিশ বাহিনী গাড়িতে উঠে বসলো, তাদের সবার মুখ বিষণ্ন মলিন বিমর্ষ, পরাজিত অবস্থায় ফিরে চলেছে তারা।

গাড়ি দু'খানা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই বনহুর ডালপালা আর আগাছা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কাউকে কোথাও দেখা গেলো না, বনহুর বুঝলো বিপদ কেটে গেছে। এবার সে ক্ষুধা–পিপাসা দারুণভাবে অনুভব করলো। পা দু'খানা অবশ লাগছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, বড় অস্বস্তি বোধ করছে সে।

তবু সে এগুতে লাগলো। না এগিয়েই বা কি করবে, চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না। তাকে ফিরে যেতে হবে তার আস্তানায়, কান্দাই ছেড়ে বহুদূর সে এসে পড়েছে, হেঁটে যাবার কোনো উপায় নেই। যানবাহন কিছু এদিকে আসে না বা নেই, এখন ফিরে যাবার কোনো পথও দেখছে না সে।

এগুচ্ছে বনহুর।

পাহাড়টার ওপাশে কোনো পথ আছে কিনা বা যানবাহন চলে কিনা দেখতে সে তাই পাহাড় বেয়ে আরও উপরে উঠতে লাগলো।

সে দিনটাও কেটে গেলো বনহুরের।

পরদিন আবার সূর্য উদিত হলো। গাছে গাছে পাখির কলরব জেগে উঠলো।

বনহুর আবার চলতে শুরু করলো।

তিনদিন অবিরত চলার পর পাহাড়ের ওপারে গিয়ে পৌঁছলো বনহুর।

আশ্চর্য হলো সে।

পাহাড়ের ওপাশে এক নতুন জগত।

পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে একটা নদী, শাখা–প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে প্রান্তরের মধ্যে চারদিকে শ্যামল দুর্বা ঘাস।

পরিবেশটা দুনয়ন জুড়িয়ে দেয়।

বনহুর নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, হঠাৎ তার নজর পড়লো অদূরে নদী তীরে কয়েকজন তরুণী কেউ বা বসে আছে, কেউ বা ঘাসের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ বা ছুটাছুটি করছে। প্রায়। আট দশজন তরুণী–এরা মনের আনন্দে উচ্ছল হাসি হাসছে।

বনহুর আরও এগুলো।

কতগুলো পাথর ছড়িয়ে পড়েছিলো আশেপাশে। সেই পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেলো সে। এবার পাথরখন্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করলো, বুঝতে পারলো তরুণীরা পিকনিকে এসেছে। তারা সবুজ ঘাসের উপর নানারকম খাদ্যসম্ভার বিছিয়ে বসেছে।

ক্ষুধার্ত বনহুরের জিভে পানি এসে যায়, যদি ঐ খাবারগুলোর কিছুটা তার ভাগ্যে জুটতো। শুধু খাবার দেখে খুশি নয়, বনহুর বেশি খুশি হয়েছে মানুষ দেখে বুঝতে পেরেছে এ পাহাড়ে সে একা নয়।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো কিভাবে ওদের কাছে পৌঁছনো যায়। তবে এক্ষুণি সে পৌঁছতে পারে, কিন্তু পৌঁছানোটা বড় কথা নয়, কিভাবে তাদের সঙ্গে পরিচয় করবো, সে তাই ভাবতে লাগলো।

তখন তরুণীরা রেকর্ড বাজিয়ে নাচতে শুরু করেছে। সবাই বেশ তাল মিলিয়ে নাচছে। কেউ কেউ হাতে তালি দিচ্ছে আর কেউ কেউ খিলখিল করে হাসছে।

ওরা নাচ শেষ করলো।

খাবারগুলো কিন্তু তখনও ঘাসের বিছানায় ঝুড়ির মধ্যে থরে থরে সাজানো রয়েছে।

বনহুর প্রতীক্ষা করছে, এবার ওরা নিশ্চয়ই খেতে বসবে। নাচ শেষ হলো কিন্তু খেতে ওরা বসলো না। এবার সবাই স্নানের পোশাক পরে নিলো।

খুব খুশি লাগছে বনহুরের, তবে তরুণীদের স্নানের পোশাকে সজ্জিত হতে দেখে খুশি লাগছে, নিশ্চয়ই এবার তারা নদীতে গিয়ে নামবে। এই সুযোগ সে কিছুতেই নষ্ট করবে না।

প্রস্তুত হয়ে নিলো বনহুর।

তরুণীরা স্নানের পোশাকে সজ্জিত হয়ে নদীর দিকে ছুটে যাচ্ছে সবাই। সবার মুখেই হাসির উচ্ছলতা। দল বেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা।

সবাই গেছে, কেউ তীরে নেই।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে দ্রুত পাথরখন্ডগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে নদীতীরে পৌঁছে গেলো এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঝুড়ি সহ ফলগুলো নিয়ে সরে পড়লো।

তরুণীরা তখন নদীতে প্রাণ খুলে সাঁতার কাটছে।

বনহুর ফলের ঝুড়িসহ ফলগুলো নিয়ে পাথরটার আড়ালে গিয়ে বসলো, তারপর গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো। এত বেশি ক্ষুধার্ত হয়েছিলো বনহুর, যার জন্য অনেকগুলো ফল খেয়ে ফেললো অল্প সময়ে।

ক্ষুধা–পিপাসা দূর হয়ে গেলো বনহুরের, প্রাণভরে সে খেয়েছে। সামান্য কিছু ঝুড়িগুলোতে রয়েছে মাত্র।

বনহুরের খাওয়া শেষ হতেই তরুণীদের হাসির শব্দ কানে ভেসে এলো, তাড়াতাড়ি সে পাথরখটার আড়াল থেকে সরে গেলো দূরের একটা পাথরখন্ডের আড়ালে। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তরুণীদের।

ওরা নদী থেকে তীরে উঠেই যে যার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে নিলো।

যদিও তরুণীদের সৌন্দর্য বনহুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, তবু সে নিজকে সংযত করে নিলো এবং দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো সম্মুখের সীমাহীন আকাশের দিকে।

নীল স্বচ্ছ আকাশে শুধু মেঘের আনাগোনা তার কাছে অপূর্ব লাগে। নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে বনহুর সেইদিকে।

হঠাৎ তার কানে আসে তরুণীদের ব্যস্ততাপূর্ণ ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

বনহুর ফিরে তাকায় পাথরখন্ডের আড়াল থেকে, সে দেখতে পায় তরুণীরা স্নানের পোশাক ত্যাগ করে সবাই ফিরে এসেছে তাদের খাবারের পাশে। সব রয়েছে, কিন্তু ফলমূলের ঝুড়ি উধাও হয়েছে। এসব গেলো কোথায় এ নিয়েই ব্যস্ত এবং ভীত হয়ে উঠেছে তরুণীদল। সবাই ভয়বিল কঠে বলাবলি করছে, কেউ বলছে নিশ্চয়ই চোর এসেছিলো, কেউ বলছে কোনো জন্তুর কাজ, নইলে মূল্যবান জিনিসপত্র সব রয়েছে অথচ শুধু ফলমূলের ঝুড়ি উধাও হলো কেন? চোর এলেতো মূল্যবান জিনিসপত্র সব সে নিয়ে যেতো। কেউ বলছে ঠিক কোনো বানরের কাজ, বানর ফলের ঝুড়ি নিয়ে ভেগেছে।

তরুণীরা এদিক ওদিক ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। হঠাৎ ঐ পাথরখন্ডটার পাশে এসে একটা তরুণী চিৎকার করে উঠলো–এই দেখো এখানে ফলের খোসা পড়ে আছে, এসো দেখো দেখো......

তরুণীরা সবাই ছুটে এলো।

সবাই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলো তাদের ফলের ঝুড়ি এবং ফলের খোসাগুলো পড়ে আছে পাথরখটার পাশে আড়ালে।

তরুণীদের চোখ ছানাবড়া, কে এ কাজ করলো, আশেপাশে কাউকে তো দেখছে না তারা।

বনহুর এবার লক্ষ্য করলো তরুণীরা রীতিমত সন্ধান চালিয়ে চলেছে। এখন তারা এদিকেই আসছে, বনহুর হাতের উপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে ঘুমের ভান করে রইলো।

তরুণীরা এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করছে, এমনকি প্রত্যেকটা পাথরখন্ডের আড়ালে তল্লাশি চালিয়ে চলেছে ওরা। এবার তরুণীদের কথাবার্তার শব্দ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো তার।

হাঁ, তাই বটে, তরুণীদল এবার সেই পাথরখন্ডটার পাশে এসে পড়লো। তারা প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, মানুষ...... মানুষ....... মানুষ.......

তরুণীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সবাই অবাক হয়ে দেখছে বনহুরকে।

একটা তরুণীর কণ্ঠ শুনতে পেলো বনহুর, তরুণী বলছে–এ লোকটাই আমাদের সব ফল খেয়েছে।

আর একজন বললো–হাঁ, ঠিক এই লোকটার কাজ।

অপর একজন তরুণী বললো– এই লোক, নিশ্চয়ই কোনো পাগল হবে।

একজন বললো–চলো নিকটে গিয়ে দেখি।

অপর একজন বললো–এই নির্জন স্থানে মানুষ চিন্তাই করা যায় না।

চলো গিয়ে দেখি।

সবাই জোট পাকিয়ে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। ওরা ভাল করে লক্ষ্য করলো বনহুরকে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা এবং স্থানে স্থানে ছেঁড়া জামাকাপড়। চুল রুক্ষ অঘোরে ঘুমাচ্ছে লোকটা।

এক তরুণী সাহস করে এগিয়ে এলো, বনহুরের ঠিক কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলো– এই শুনছো, এই শুনছো?

ততক্ষণে তরুণীরা সবাই ঘিরে ধরেছে বনহুরকে।

বনহুর তো খুব করে নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

আরও জোরে ডাকছে তরুণীটা–এই শুনতে পাচ্ছো না? কে তুমি? বলো না কে তুমি?

চোখে রগড়ে তাকাতেই সে যেন প্রথম তরুণীদের দেখতে পেলো, এমনি ভাব নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময় নিয়ে তাকাতে লাগলো সবার দিকে।

তরুণীরা তো অবাক।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মলিন বসন রুক্ষ চুল, তবু তাকে দেখে সবাই যেন কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো।

বনহুর কিন্তু সবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে! তরুণীরা যে তাকে দেখে অবাক হয়েছে, সে বেশ বুঝতে পারে বনহুর কোনো কথা না বলে নদীর দিকে পা বাড়ায়।

তরুণীরা কিছু বলাবলি করলো তারপর একজন এগিয়ে গিয়ে ডাকলো–এই শোন।

বনহুর থামলো।

সবাই তখন এগিয়ে এলো, বললো একজন–এই, তুমি আমাদের সব ফল খেয়েছে কেন?

বনহুর নীরব।

বললো অপরজন–তোমার নাম কি? এই বলো না তোমার নাম কি?

বনহুর তবু নিশ্চুপ!

তরুণীরা বনহুরকে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো।

কেউ বললো, পাগল–কেউ বললো বধির কেউ বললো বোবা, না হলে কথা বলছে না কেন।

তরুণীরা তো হতবাক, ওরা বনহুরকে ঘিরে ধরে বলানোর চেষ্টা করছে। তরুণীদের আচরণে বোঝ গেলো বনহুরের সৌন্দর্য তাদের মনকে আকৃষ্ট

করেছে। যদিও বনহুরের পোশাক–পরিচ্ছদ নানা স্থানে ছিঁড়ে গেছে এবং ময়লা হয়ে উঠেছে। চুলগুলো এলোমেলো তৈলহীন। তবু ওকে বড় সুন্দর লাগছিলো। তার সঙ্গে সৌন্দর্য আরও বেড়েছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বুকের খানিকটা অংশ মুক্ত, কারণ জামার বোম ছিঁড়ে যাওয়ায় বুক ভোলা রয়েছে। প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, রক্তবর্ণ দেহ, তরুণীরা অবাক হয়ে দেখছে তাকে।

তরুণীদের ভাব লক্ষ্য করে বড় হাসি পাচ্ছিলো বনহুরের। তবু সে হাবাগোবার মত নীরব রইলো। যা হোক যেমন করে থোক এদের গাড়িতেই তাকে লোকালয়ে ফিরতে হবে। তরুণীরা যখন নদীর পানিতে সাঁতার কাটছিলো তখন বনহুর অদূরে থেমে থাকা তাদের গাড়িখানা কৌশলে বিগড়ে দেয় এবং ফিরে আসে। সেই স্থান যেখানে সে ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিলো। জানে বনহুর, তরুণীদের কেউ গাড়ির বিকল অবস্থা ধরতে পারবে না। সে আরও লক্ষ্য করেছে তাদের সঙ্গে কোনো ড্রাইভার নেই।

ড্রাইভার না থাকায় বনহুরের আশা আছে সে তরুণীদের হাত করতে পারলেই যেমন করে তোক ফিরে যেতে পারবে, লোকালয়ে পৌঁছতে পারলেই আর তার কোনো চিন্তা নেই।

বনহুর আবার পা বাড়ালো।

তরুণীরা তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, যেওনা–শোন।

বনহুর তবু শুনলো না, সে নদীর দিকে চলে যাচ্ছে।

তরুণীরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর একজন বললো–চল এবার ফিরে যাওয়া যাক।

ঐ পাগলটা একা থাকবে এখানে? বললো এক তরুণী।

একজন বললো–থাকবে না তো কি, সঙ্গে নিয়ে যাবি?

অন্যজন বললোলোকটা নিশ্চয়ই অসহায়......।

একজন মুচকি হেসে বলল–ওর প্রতি বেশ দরদ জমে উঠেছে দেখছি।

অন্য তরুণী বললো–সত্যি লোকটা ভারী সুন্দর কিন্তু। কথাটা সে অপর এক তরুণীর কানে মুখ নিয়ে বলল। তারপর বললো–বেচারী নিশ্চয়ই লোকটা। মাথা খারাপ হয়ে চলে এসেছে এই নির্জন পাহাড়ের পাদমূলে। দেখলি না আমাদের কতগুলো ফলমূল ও একাই খেয়ে ফেলেছে।

অন্য এক তরুণী বলল,–আহা বেচারা কদিন হয়তো অনাহারে কাটিয়েছে, তাই ক্ষুধার জ্বালায় ফলগুলো খেয়েছে।

সত্যি, আমার কিন্তু ওকে শহরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে? হয়তো ওর কেউ নেই কিংবা আছে যাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে ও, দূরে বহু দূরে এই নির্জন পাহাড়ের পাশে। ওকে মেন্টাল হসপিটালে দিলে আবার হয়তো ও সুস্থ হয়ে উঠবে, হয়তো ফিরে যাবে ওর আত্নীয়স্বজনের পাশে……তরুণীটার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো অন্য এক তরুণী–পাগলের কোনো জ্ঞান আছে নাকি? ওকে নিতে চাইলে কি যাবে? দেখছিস না কেমন একরোখার মতো নদীর দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের কোনো কথাই ও বুঝতে পারেনি বা শুনতে পায়নি।

দলের নেত্রী যে তরুণী, সে বললো–চল সবাই মিলে ওকে আর একবার জিজ্ঞাসাবাদ করি।

সবাই মিলে বললো–তাই চল।

কিন্তু ঐ সময় আকাশে ভীষণভাবে মেঘ করে এলো। সেদিকে তাকিয়ে একজন বললো–সর্বনাশ, ঝড় উঠবে। আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে।

তাই তো! সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো।

সবার মুখেই ভীতিরভাব ফুটে উঠেছে।

বনহুরও আকাশের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলো। সে বুঝতে পারলো, অল্পক্ষণেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। তরুণীরা বারবার তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। সবার মুখে ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

তরুণীরা এবার ছুটলো গাড়ির দিকে।

দু একজন দাঁড়িয়ে রইলো, তারা পাগলটাকে লক্ষ্য করছে তখনও! সঙ্গিনীরা ডাকলো,–ওরে আয় বৃষ্টি এলো ঝড় উঠবে এখন।

তবু ওরা দাঁড়িয়ে আছে পাগলটার দিকে তাকিয়ে।

পাগলটা তখন গিয়ে নদীর ধারে ঘাসের উপর বসে পড়েছে, সে মাঝে মাঝে ঘাড় বাকিয়ে দেখে নিচ্ছে তরুণীদের।

একজন তরুণী একে হাতের ইশারা দিয়ে ডাকলো।

অপর তরুণী বললো–ওকি আসবে, চল আমরা যাই।

তবু তরুণীটা বার দুই হাত তুলে ডাকলো, তারপর ওরা থেমে থাকা গাড়িখানার দিকে এগুলো।

নেত্রীস্থানীয়া তরুণ ড্রাইভ আসনে গিয়ে বসতেই সমস্ত তরুণী গাড়িতে উঠে বসলো।

গাড়ি স্টার্ট দিলে নেত্রীস্থানীয়া তরুণী, কিন্তু একি! গাড়িতে স্টার্ট নিচ্ছে না।

মুহূর্তে তরুণীদের মুখ শুকিয়ে গেলো, চোখে তারা সব ঘোলাটে দেখছে, এখন উপায়?

বারবার চেষ্টা করছে তরুণীটা, কিন্তু গাড়ি কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না। মহাবিপদে পড়ে গেলো তরুণীরা, এখন তারা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা ভীষণ আকার ধারণ করেছে।

ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

তরুণীরা যখন হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন বনহুর আর চুপ থাকতে পারলো না। তরুণীদের আচরণে যদি সে ক্ষুদ্ধ হতো, মানে তারা যদি তার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করতো তাহলে সে ওদের নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়তো। কিন্তু বনহুরকে ওরা সমীহ করেছে, ওদের মুখের গ্রাস ফলগুলো খাওয়ায়ও ওরা কোনো অসৎ আচরণ করেনি তার উপর। তাই সে ভাবলো, যা হয়েছে তাই যথেষ্ট

এবার চুপ থাকা যায় না, কারণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে মহা মুস্কিল হবে। বিশেষ করে ওরা মেয়েমানুষ, প্রচন্ড ঝড়ের মুখে ওরা দিশেহারা হয়ে পড়বে।

বনহুর এগিয়ে এলো গাড়িখানার পাশে।

পাগলটাকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলো তরুণীরা। তারা বুঝতে পারলো মেঘ দেখে পাগলটাও ভয় পেয়ে গেছে। ওরা কেউ কেউ বললো–্যা হোক পাগল হলেও তো পুরুষ মানুষ তবু কিছুটা সাহস, কি বলিস?

অপর তরুণী বললো–সাহস না ছাই, কথায় বলে পাগল একটা ছাগলের সমাস। বরং ওকে নিয়ে আমরা বিপদে পড়বো।

ড্রাইভ আসন থেকে সেই তরুণী বললো–বিপদে আর পড়তে হবে না, বিপদ এমনিই ঘনিয়ে এসেছে। এবার কি উপায় করবে তাই ভাবো। গাড়ি আর চলবে না। কথাটা বলে নেমে এলো সে ড্রাইভ আসন থেকে।

অন্যান্য তরুণীদের মুখ চুন হয়ে গেছে। এখন উপায়।

পাগলটা তাদের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে সবার মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে নিয়ে ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো।

তরুণীরাতো অবাক, সবাই হতবাক হয়ে তাকালো পাগলটার দিকে, পাগল একি করছে।

কিন্তু পাগলটা ড্রাইভ আসনে বসে ষ্টার্ট দিলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দ্রুতবেগে চলতে শুরু করলো। এমন কি তরুণীরা হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি তাদের ছেড়ে চলে গেলো নদীর তীর ধরে দূরে।

তরুণীরা হায় হায় করে উঠলো।

সর্বনাশ হলো, পাগল গাড়িখানা নিয়ে এখন একসিডেন্ট করে বসবে। কিন্তু ভয়ংকর অবস্থায় পড়লো তারা। সবাই আর্তচিৎকার করে উঠলো। কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

আকাশে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ভীষণভাবে। সা সা করে বাতাস বইতে শুরু করে দিয়েছে। তরুণীরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো।

ঠিক ঐ সময় গাড়িখানা আচমকা এসে থেমে পড়লো তরুণীদের সম্মুখে।

সবাই তো অবাক।

গাড়ি নিয়ে পাগলটা যে ফিরে আসবে, এ কথা ভাবতে পারেনি তরুণীরা। তারা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে এ–র মুখের দিকে তাকালো।

পাগলটা তখনও ড্রাইভ–আসনে বসে আছে এবং সে তখনও নিশ্চুপ, কোনো কথা সে বলছে না।

তরুণীরা যখন হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন একজন বলে উঠলো বৃষ্টি এসে গেছে, গাড়িতে উঠে বস্ সবাই।

তাই করলো তরুণীরা।

সবাই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো বনহুর।

তরুণীরা বিস্ময়ে হতভম্ব। একি, পাগলটা তো সুন্দর গাড়ি চালাচ্ছে। দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি এগিয়ে চললো।

ওদিকে শুরু হলো ভীষণ ঝড়বৃষ্টি।

গাড়ি তবু এগুচ্ছে।

তরুণীরা ভাবছে তারা তো স্বপ্ন দেখছে না। অজানা অচেনা জায়গায় তারা এলো পিকনিকে, কিন্তু হঠাৎ তাদের ফলগুলো হলো চুরি। ফলের সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়লো। হঠাৎ পাথরখন্ডের আড়ালে দেখতে পেলো তাদের ফরের খোসাগুলো পড়ে আছে! দেখে তো সবার চক্ষুস্থির! এখানে খোসা এলো কি করে–তরুণীরা হতবাক হলো, খুঁজতে লাগলো তাদের ফলগুলো কে চুরি করে খেয়েছে। তারপর যখন তারা অপর পাথর খন্ডটার ওপাশে গেলো তখন তারা দেখতে পেলো একটা লোককে! লোকটা তখন ঘুমে অচেতন, যখন তার ঘুম

ভাঙলো দেখলো সাধারণ লোক নয়, হারিয়ে যাওয়া এক রাজকুমার...... আচমকা গাড়িখানা থেমে পড়লো। সবার চিন্তাধারাও থেমে গেলো একসঙ্গে।

ভীষণ বেগে ঝড় শুরু হয়েছে।

গাড়িতে বসে ওরা দেখলো নদী এবং পাহাড় ছেড়ে তাদের গাড়ি অনেক দূরে এসে পড়েছে। পাহাড় তেমন আর নজরে পড়ছে না। তবে নদীরা দু'একটা শাখা প্রান্তরের বুক চিরে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেল এদিক ওদিকে।

পথ ছিলো না, শুধু প্রান্তর।

এখন গাড়িখানা থেমে পড়তেই সবার চমক ভাঙলল, এতক্ষণ তারা যেন সম্বিৎহারার মত গাড়ির মধ্যে বসেছিলো এবার তাদের হুশ হলো।

তারা গাড়ির শাশীপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছে বাইরে সেকি ভীষণ ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। কোনোকিছু সহজে নজরে পড়ছে না, বৃক্ষলতাগুলো এপাশ থেকে ওপাশে হেলেদুলে পড়ছে, যেন এক একটা কৃষ্ণকায় দৈত্যরাজ হেলেদুলে নৃত্য করছে।

তরুণীরা একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলো। পাগলটা তাদের এভাবে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছে, যেন সে দক্ষ ড্রাইভার।

এবার তরুণীরা দেখলো সম্মুখে একটা ডাকবাংলো ধরনের অট্টালিকা। আশেপাশে আর তেমন কোনো বাড়িঘর বা দালানকোঠা নেই।

গাড়িখানার পাশ কেটে চলে গেলো দু'একটা যানবাহন। বুঝতে পারলো বনহুর তারা লোকালয়ের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। তবে একেবারে লোকালয়ে নয়, যেখানে সে গাড়ি থামিয়েছে, সেটা হলো কোন ডাকবাংলো, তবে সঠিক কিনা জানে না বনহুর।

গাড়ি থামতেই বনহুর গাড়ি দরজা খুলে নেমে পড়লো, তারপর এগুলো সে এ ডাকবাংলা লক্ষ্য করে।

তরুণীরা একদন্ড বিলম্ব না করে পাগলটাকে অনুসরণ করে নেমে পড়লো। যদিও তাদের কেহ বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে যাচ্ছিলো তবু গাড়ি ত্যাগ না করে

পারলো না তারা।

বনহুর যখন ডাকবাংলোটার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো তখন অন্যান্য তরুণী সবাই এসে পড়েছে। কেউ বা দৌড়ে, কেউ বা দ্রুত হেঁটে এসে উঠেছে।

ভিজে চুপসে গেছে তরুণীরা।

ওরা পাগল ড্রাইভারটার দিকে তাকাবার অবকাশ পেলো না। সবাই ডাকবাংলো অত্যন্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। ভুলে গেলো ওরা পাগল ড্রাইভারের কথা। কিন্তু নেতৃস্থানীয় তরুণী সে পাগলটার কথা তুললো না, বললো–ঝড়ের মধ্যে বেচারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ও না হলে আমরা আজ কি যে বিপদে পড়তাম!

অপর এক তরুণী বললোসত্যি, ওকে ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় নেই। পাগল বটে কিন্তু আশ্চর্য ও কার্যকলাপ। এখন পর্যন্ত একটা কথাও আমাদের সঙ্গে বলেনি অথচ আমাদের কি উপকারটাই না করলো।

আর একজন তরুণী বললো–লোকটা নিশ্চয়ই পাগল নয়। পাগল হলে সে কিছুতেই দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালিয়ে আসতে পারতো না।

সত্যি লোকটা অদ্ভুত।

অদ্ভুত নয়, বিস্ময়কর, আমাদের যে উপকার সে করলো তা ভুলবার নয়।

চল যাই ওকে ডেকে আনি। বললো নেত্রীস্থানীয় তরুণী।

ক'জন মিলে বেরিয়ে এলো দকা হাওয়া উপেক্ষা করে, চুল আর কাপড়ে উড়ছে হাওয়ায়। তেমনি পানির ঝাপটা লাগছে পায়ে, এক একজন ভিজে চুপসে গেছে যেন।

কিন্তু ওরা বাইরে এসে দেখতে পেলো তাদের এই পাগল ড্রাইভার নিখোঁজ হয়েছে। তারা এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেক সন্ধান করলো, তবু কাউকে দেখতে পেলো না, শুধু দেখলো একটা বাস চলে গেলো ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা করে। বাসের পিছনে আলো দুটো জ্বলছিলো পিটপিট করে, ওরা যেন বিদ্রূপ করে চলে যাচ্ছে তাদের।

তরুণীরা অবাক হলো, এই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে লোকটা গেলো কোথায়। অনেকক্ষণ ধরে সন্ধান করলো ওরা এপাশে ওপাশে কিন্তু কোথাও আর তাকে পাওয়া গেলো না।

একসময় ঝড় থেমে গেলো।

আকাশ পরিস্কার হয়ে এলো, পথে যানবাহন চলতে শুরু হলো।

তরুণীরা ডাকবাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। সবার চোখেই বিষাদের ছায়া। লোকটা গেলো কোথায়? ওর প্রতি সবার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো। লোকটা তাদের যে উপকার করেছে তার জন্য তারা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

একজন তরুণী বললো–লোকটা আমাদের ফল খেয়েছিলো আমাদের না জানিয়ে, তাই সে ফল খাওয়ার প্রতিদান দিয়ে গেলো নীরবে।

ঠিক বলেছিস তুই, ও আমাদের ফল খেয়েছিলো বলেই এই উপকার করে গেলো।

আশ্চর্য লোকটা।

সত্যি আশ্চর্য বটে।

হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে কোথায় গেলো লোকটা।

যেন একেবারে উড়ে গেছে।

তাই তো ভাবছি...

পাগল লোকটাকে নিয়ে তরুণীর নানাজনে নানা কথা বলতে লাগলো।

নেতৃস্থানীয় তরুণী বললো–ও চলে গেলো কিন্তু আমাদের মনের পর্দায় যে দাগ কেটে রেখে গেলো তা কোনোদিন মুছে যাবে না। কথাটা বলে সে আর একবার ডাকবাংলোয় বারান্দার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো তারপর থেমে থাকা গাড়ির ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো।

অন্য তরুণীরা সবাই গাড়িতে চেপে বসলো।

এবারের পিকনিক তাদের জীবনে নতুন এক রূপ নিয়ে ধরা দিলো।

গাড়ি চলেছে।

তরুণীরা সবাই আনমনা।

সবার মনেই ঐ এক চিন্তা, লোকটা কে? কি তার পরিচয় আর সে গেলেই বা কোথায়?

*

মিস লুনা, আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা আপনি করেছেন। বিফল হয়েছি আমরা, পরাজয়ের কালিমা বরণ করেছি আমরা পুলিশ বাহিনী। কথাগুলো বললেন ইন্সপেক্টার মিঃ খান।

যে দু'জন গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার গুন্ডাবেশে মিস লুনাকে সেদিন টেনে–হিঁচড়ে নিয়ে যাবার অভিনয় করেছিলেন, তারাও বসেছিলেন সেখানে।

মিঃ খান তাদেরও লক্ষ্য করে বললেন–আপনাদের অভিনয় নিখুঁত হয়েছিলো, এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। মিস লুনার সঙ্গে আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিস লুনা, আপনি আপনার পারিশ্রমিক পাবেন।

মিঃ লোদী বলেছিলেন গম্ভীর মুখে, তিনি বললেন–হ, মিস লুনা তার পারিশ্রমিক ঠিকই পাবেন এবং তা তার বাসায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

মিঃ খান বললেন–আমি নিজে গিয়ে আপনার পারিশ্রমিক আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো।

মিস লুনা হাস্যোদ্দীপ্ত মুখে বললো–অনেক ধন্যবাদ!

মিস লুনা উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ লোদী বললেন–সঙ্গে পুলিশ দেবে কি?

না, দরকার হবে না। কথাটা বলে মিস লুনা পা বাড়ালো দরজার দিকে।

ইন্সপেক্টার মিঃ খান মিস লুনাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং অনুসরণ করলেন।

মিঃ খান মিস লুনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন তার কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ জাকারিয়া, মিঃ হারুন, মিঃ কিবরিয়া এবং মিঃ ফিরোজ।

সবাই মিঃ লোদীকে অভিবাদন জানালেন।

মিঃ লোদী তাদেরকে আসন গ্রহণ করার জন্য ইংগিত করলেন।

সকলে আসন গ্রহণ করলেন। মিঃ লোদী বললেন–আপনারা এসে গেছেন ভালই হলো, কারণ আপনাদের মতই আমিও মিঃ নোমানের ডায়রী জানার জন্য উদগ্রীব।

সবাই প্রস্তুত হয়ে বসলেন।

মিঃ হারুন বললেন–স্যার, এবার ডায়রীটা বের করুন।

মিঃ লোদী হাতের অর্ধগদ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে প্রজে রেখে সোজা হয়ে বসলেন, তারপর চাবি নিয়ে ড্রয়ার খুলে বের করলেন মিঃ নোমানের ডায়রীখানা। মিঃ লোদী ডায়রীখানা টেবিলে রেখে বললেন–আমরা এতদিন ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করছি, না জানি ডায়রীর মধ্যে মিঃ নোমান সম্বন্ধে কি জানতে পারবো! কথাটা বলে তিনি ডায়রীখানা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেনঃ

আমার বয়স যখন পনেরো বছর তখন আমি হারালাম আমার মাকে। বাবা চাকরি করতেন কংগো। হসপিটালে। মায়ের মৃত্যু–সংবাদ পেয়ে বাবা দেশে এলেন এবং আমাকে নিয়ে গেলেন তার সঙ্গে কংগো হসৃপিটালে। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। আমার মোটেই ভাল লাগে না। সারা দিন আমি হসপিটালের কোয়ার্টারে বসে বসে কাটাই। দিন গুলো আমার কাটতে চায় না। দেশে সারাদিন সমুদ্রের বুকে বোট চালাতাম, পড়াশোনা করতাম কিন্তু খুব কম। সঙ্গী–সাথী আমার তেমন ছিলো না, কারণ আমি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিলাম। কথা খুব কম বলতাম, এমন কি বাবা–মার সঙ্গেও বিনা প্রয়োজনে কথা বলতাম না। সমুদ্র আর আকাশ আমার সঙ্গী–সাথী। সমুদ্রে যখন সারাদিন কাটাতাম তখন মাঝে মাঝে কাঁচা মাছ খেতাম। ক্রমে কাঁচা মাছ খাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হলো।

একদিন আমার মা এ কথা জানতে পারলেন। সেদিন গোটা দিনটা আমি সমুদ্রে কাটিয়ে দিচ্ছি, যখন ক্ষুধা পায় কাঁচা মাছ খেয়ে নেই। সন্ধ্যায় মা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের ধারে এসে পড়লেন। আমি কিন্তু তখন বোট তীরে লাগিয়ে কাঁচা মাছ খাচ্ছি। মা যে কখন আমার পিছনে। এসে দাঁড়িয়েছেন, আমি মোটেই টের পাইনি। হঠাৎ তিনি আমার হাত চেপে ধরে বললেন, এ তুই কি করছিস নোমান? আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার মায়ের মুখেচোখে বিস্ময় ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, আমি বোজ কেন সমুদ্রে আসি। একথা মা একসময় বাবাকে। জানালেন। বাবা এ কথা শুনে মোটেই অবাক হলেন না। তিনি হাসলেন মাত্র। মাকে বলতে শুনলাম, কি গো, অমন হাবার মত হাসছো কেন? ছেলে তোমার কাঁচা মাছ খায়! সে এমন অখাদ্য। খেয়ে কেমন করে বেঁচে আছে–বুঝতে পারছি না। মায়ের কথার জবাবে বাবা বললেন, নোমান অখাদ্য খায় কে বললো? মায়ের কোনো প্রশ্ন কানে এলো। না, বুঝতে পারলাম বাবার সঙ্গে মায়ের কথায় বনিবনা হলো না। এরপর থেকে মা সব সময় আমার উপর কড়া পাহারা বসালেন। যতক্ষণ নিজে পারতেন দৃষ্টি রাখতেন আর যখন নিজে পারতেন না, তখন বাড়ির চাকরটাকে আমার পেছনে লাগিয়ে রাখতেন। অসহ্য লাগলো আমার। আমি মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে, চলে যেতাম সমুদ্রে। চাকর ছোঁকড়া বড় পাজি, সে হুড় করে মাকে বলে দিতো। মা তো রেগে খুন, ছুটে আসতেন সমুদ্রতীরে এবং শুরু করতেন চেঁচামেচি। আমি ফিরে আসতাম কারণ মার চিৎকার অসহ্য লাগতো আমার। ক্রমে কাঁচা মাছ খাওয়া আমার নেশায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, আমি কাঁচা মাছ খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলাম। মার সতর্কতার জন্য আমি কাঁচা মাছ ইচ্ছামত খাওয়ার বিশেষ সুযোগ পেতাম না। তবু মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে কয়েকদিন কাঁচা মাছ খাওয়ার সুযোগ করে নিলাম। এমন দিনে মা মারা গেলেন। আমি মায়ের শোকে কাতর হয়ে পড়েছিলাম। বাবা এলেন। এবং আমাকে নিয়ে গেলেন তার কর্মস্থলে। বাবা আমাকে নিয়ে যাওয়ার পর তার নিজের কাজে ডুবে গেলেন। সারাটা দিন এবং সারাটা রাত বাবা হসপিটালে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন আর আমি বাসায় বসে ছটফট করতাম। নিকটে কোনো সমুদ্র বা নদী ছিলো না, তাই কাঁচা মাছ খাওয়া আর হলো না আমার। ক্রমে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। বাবা মাঝে–মধ্যে আসেন এবং খোঁজখবর নিয়ে যান আমার কোনো অসুবিধা। হচ্ছে কিনা। বয়–বাবুর্চিকে বাবা খুব করে বলে যান আমার সেবাযত্নে যেন কোনো ত্রুটি না হয়। বাবা ছিলেন দক্ষ সার্জন, কংগো হসপিটালে বাবা প্রতিদিন আট থেকে দশজন রোগীকে অপারেশন করতেন। কতক মারা যেতো আর কতক সেরে উঠতো। যে রোগীগুলো অপারেশনে মারা যেতে সে সব রোগীর লাশ কংগো হসপিটালের

কোনো এক লেবরেটরী কক্ষে রাখা হতো যত্নসহকারে। ঐ লাশগুলোকে পরে ওষুধের দ্বারা মমি করে রাখা হতো, মেডিক্যালের ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাবা কোনো কোনো। দিন রাতে বাসায় ফিরতেন। এমনি একদিন বাবা এলেন। বাবা যেদিন বাসায় থাকতেন সেদিন। আমার খুব আনন্দ লাগলো। কিন্তু বড় দুঃখ হতো। বাবা আমাকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দিতেন না। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ বাবার কাছে কোনো দিন ঘুমাতে পারিনি। একদিন বাবা বাসায় আছেন এবং তিনি তার শয়নকক্ষে ঘুমাচ্ছেন। আমি আমার ঘরে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ একটা ঘট করে আওয়াজ হলো। ঘুম ভেঙে গেলো আমার। কান পাততেই বুঝতে পারলাম বাবা তার কক্ষের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমি জানালা দিয়ে দেখতে লাগলাম। বাবা চুপি চুপি বাইরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বাবা যখন বাইরে বেরিয়ে গেলেন তখন আমিও দরজা খুলে বাবাকে অনুসরণ করলাম। বাবা কিন্তু আমাকে মোটেই। দেখতে পাননি। তিনি সোজা এগিয়ে চলেছেন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে। লক্ষ্য করলাম, বাবা হসপিটালের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও তাকে অনুসরণ করে চলেছি। বাবা সম্মুখপথ দিয়ে না গিয়ে হসপিটালের পিছনের দেয়াল টপকে ঐ ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন যে ক্যাবিনে মৃতদেহগুলো রাখা হতো। চাবিটা বাবার কাছেই ছিলো, তাই তিনি সহজেই দরজা খুলে ফেললেন। ক্যাবিটার এ অংশে তেমন কোনো আলো ছিলো না। একটা ডিমলাইট জ্বল ছিলো, সেই আলোতে বাবাকে যমদূতের মত মনে হচ্ছিলো। বাবা কিন্তু ততক্ষণে কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আমি এসে দরজার পাশে দাঁড়ালাম, ভিতরে ডিমালাইটের আলোতে অস্পষ্ট দেখতে পেলাম বাবা একটা মৃতদেহ তাক থেকে টেবিলে নামিয়ে নিলেন। আমি বিপুল আগ্রহ নিয়ে দেখছি, বাবা মৃতদেহটার বুক চিরে ফেললেন, বের করে। নিলেন মৃতদেহটার বুকের ভিতর থেকে কলিজা সহ হৃৎপিন্ডটা, তারপর খেতে লাগলেন তিনি মনের আনন্দে। যদিও আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না তবু বুঝতে পারলাম তিনি মৃতদেহের ভিতর। থেকে কলিজা সহ হৃৎপিন্ড তৃপ্তি সহকরে খেলেন। এরপর তিনি আলো জ্বাললেন এবং দ্রুতহস্তে মৃতদেহের বুক সেলাই করে পূর্বের ন্যায় তাকে। সাজিয়ে রাখলেন। আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে। ফিরে এলাম আমাদের বাসায় এবং নিজের ঘরে শুয়ে চোখ বন্ধ করলাম। কিন্তু ঘুম আমার এলো না, বারবার বাবার কার্যকলাপের দৃশ্য আমার চোখে ভাসতে লাগলো। আমার বাবা মৃত মানুষের কলিজা আর হৃৎপিন্ড খেলেন.....

মিঃ লোদী এতক্ষণ এক নিঃশ্বসে পড়ে চলেছেন মিঃ নোমানের ডায়রীখানা। সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছেন, কারও মুখে কোনো কথা নেই। সকলেই মিঃ

নোমানের ডায়রী জানার জন্য ব্যাকুল। মিঃ লোদী যখন থামলেন তখন সবাই নড়ে চড়ে বসলেন। মিঃ লোদী একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে কয়েকমুখ ধোয়া ছাড়লেন। তারপর বললেন–আশ্চর্য, মিঃ নোমানের পিতাও তাহলে নরমাংস খেয়েছিলো।

তাইতো স্যার তার সন্তান নররাক্ষস হয়েছিলো। বললেন মিঃ কিবরিয়া।

মিঃ হারুন বললেন মিঃ নোমানের বাবা তাহলে কংগো হসপিটালের সার্জন ছিলো এবং ঐ সময় সে নরকলিজা আর হৃৎপিন্ড খেতো।

বললেন মিঃ ফিরোজ–যেমন পিতা তেমনি সন্তান……

মিঃ লোদী সিগারেটে বারকয়েক টান দিয়ে বললেন–তাই তো দেখছি। কথাটা বলে তিনি আবার পড়তে শুরু করলেনঃ

যত ভাবছি ততই বাবার নর–কলিজা খাওয়ার দৃশ্যটা আমাকে আকৃষ্ট করে তুলেছে। আমার মনে জাগছে কাঁচা মাছ খাওয়ার লোভ। তারপর আমি আমার বাবাকে আরও কয়েকদিন এই কাজে লিপ্ত হতে দেখলাম। আমার নিজের মনেও তখন ভীষণ এক লালসাপূর্ণ ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। কি করে আমি নরকলিজা খেতে পারবো, এই হলো আমার চেষ্টা। সব সময় ভাবতাম, কি করে বাবার পকেট থেকে হসপিটালের ঐ ক্যাবিনটার চাবি আমি নিতে পারবে। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হলো না। আমি তখন ভাবতে। লাগলাম নতুন এক পথ। একদিন নিস্তব্ধ দুপুরে কেউ কোথাও নেই, তখন আমি আমার বাবার ছোকরা চাকরটাকে হত্যা করলাম। গলা টিপে তাকে হত্যা করলাম আমি। ছুরি দিয়ে তার বুক চিরে ফেললাম, বের করে নিলাম তার কলিজা আর হৃৎপিন্ড। তারপর খেলাম তৃপ্তি সহকারে, যেমন কাঁচা মাছ আমি খাই তেমনি করে। উঃ। কি স্বাদ, জীবন্ত মানুষের কলিজা খেয়ে আমি সেদিন যে স্বাদ পেলাম তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তারপর থেকে জীবন্ত নর কলিজা খাওয়া আমার নেশায় পরিণত হলো। মাসে অন্ততঃ একটা নরকলিজা না খেলে আমি তৃপ্তি পেতাম না। তারপর বয়স আমার যত বাড়তে। লাগলো ততই আমি উন্মাদ হয়ে উঠলাম। মাস পেরিয়ে সপ্তাহে একটা মানুষ হত্যা করা আমার চাই…….বয়স আমার যখন বিশ বছর তখন আমি এমন হয়ে উঠেছি, নর–কলিজা খাওয়া ছাড়া আমার কিছু ভাল লাগে না। বাবা তখন মৃত্যুবরণ করেছেন। অবশ্য বাবার মৃত্যু ঘটেছিলো অদ্ভুতভাবে। একদিন বাবা হসপিটাল থেকে নর–কলিজা খেয়ে দেয়াল টপকে বেরিয়ে

আসছিলেন, ঠিক তখন কে বা কারা তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলো। অকস্মাৎ। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন এবং পড়ে গেলেন দেয়ালের নিচে। আর চোখ মেলে তিনি তাকালেন না। বিশ বছর বয়সে আমি হারালাম আমার। বাবাকে। তারপর চললো আমার অভিযান। শহর বন্দর, গ্রাম–গঞ্জ জায়গা আমি ঘুরে বেড়ালাম। কোনো জায়গায় আমি দু'মাসের বেশি থাকতাম না বা থাকি না। কারণ প্রতিদিন আমার হত্যালীলা চলে এবং আমি নর–কলিজা আর হৃৎপিন্ড খাই আমার জন্মদাতার মত। কোনো জায়গায় বেশিদিন থাকতাম। না, কারণ যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে কেউ। আমাকে ক্ষমা করবে না বা করতে পারে না। এখন আমার বয়স পঞ্চাশ, আমি কত হত্যা করেছি আমার নিজেরও হিসেব নেই। তবে হাজার হাজার তো বটেই। আজও আমি হত্যা করে চলেছি। কান্দাই শহরে অবস্থান করছি আজ কয়েক মাস হলো। এখানে আসার পর আমি একশত পঁচিশটা নর–কলিজা খেয়েছি। আজ আমি বেদেনী মেয়েটাকে ইচ্ছা করলে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু সে আমাকে কথা দিয়েছে তার জীবন–ভিক্ষা পেলে সে রোজ গোপনে আমাকে একটা করে শিকার। জোগাড় করে দেবে। আমি তাই তার জীবন–ভিক্ষা দিয়েছি। আজ আমি চলেছি সেই মিসকা সেতুর পাশে বটবৃক্ষটার তলায়। সেখানে বেদেনী আমার জন্য শিকার নিয়ে অপেক্ষা করছে। নতুন শিকার। আমি তাকে আমার এই হোটেলকক্ষে নিয়ে আসবো, তারপর হবে আমার কান্দাই শহরে এক শত ছাব্বিশটা জীবন্ত নর–কলিজা খাওয়া। কান্দাই বাসী জানে আমি একজন বৈজ্ঞানিক, হোটেল কক্ষে বসে দিনরাত গবেষণা করি। তাই কেউ আমার কক্ষে প্রবেশ করে না। ওরা যদি আমার কক্ষে প্রবেশ করতো তাহলে বুঝতে পারতো, জানতে পারতো আমি কে, কি আমার উদ্দেশ্য........

মিঃ লোদী থামলেন, কারণ মিঃ নোমানের ডায়রীখানা এখানেই অসমাপ্ত থেমে গেছে। মিঃ লোদী ডায়রীখানা টেবিলে রেখে সিগারেটের কেসটা তুলে নিলেন হাতে এবং একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন–মিঃ নোমানের ডায়রী থেকে তার বিচিত্রময় জীবন কাহিনী শুনলেন আপনারা?

হাঁ, আশ্চর্য এক কাহিনী আমরা আজ জানতে পারলাম মিঃ নোমানের ডায়রী থেকে। মিঃ নোমানের পিতা খেতো মৃত মানুষের কলিজা আর মিঃ নোমান খেতো জীবিত মানুষের কলিজা।

শুধু তাই নয়, আমরা যদি ভালভাবে সন্ধান নিয়ে দেখতে চাই তাহলে মিঃ নোমানের পূর্বপুরুষদের জীবন–কাহিনী থেকে আমরা এমন অনেক বিস্ময়কর

ঘটনা জানতে পারবো যা মিঃ নোমানের জীবনকাহিনী থেকেও বিস্ময়। কথাগুলো বললেন মিঃ লোদী। তারপর কয়েকমুখ ধোয়া ছেড়ে তিনি বললেন– পুলিশ মহলের দৃষ্টি এড়িয়ে মিঃ নোমান কান্দাইয়ের বুকে অনেকদিন থেকে এই ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত হত্যাকান্ড চালিয়ে চলেছিলো এবং নর–কলিজা খেয়ে চলেছিলো। অথচ কেউ তাকে সন্দেহ করেনি কিংবা করতে পারেনি। দস্যু বনহুর তা সমাধান করেছে.......

আচ্ছা স্যার, ঐ বেদেনী মেয়েটা তাহলে কে? বললেন মিঃ ফিরোজ।

মিঃ লোদী জবাব দেবার পূর্বে বলে উঠরেন মিঃ কিবরিয়া–মেয়েটার সঙ্গে মিঃ নোমানের কোনো সম্বন্ধ ছিলো না বলেই মনে হচ্ছে।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়, কারণ মিঃ নোমান তার ডায়রীতে লিখেছে, বেদেনী মেয়েটা তার শিকার ছিলো এবং সে তাকে প্রতিদিন একটা করে শিকার এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন ভিক্ষা পেয়েছিলো।

তাহলো বেদেনী সম্পূর্ণ নির্দোষ?

হাঁ, আমার মনে হয় বেদেনী সম্পূর্ণ নির্দোষ।

স্যার, তাহলে বেদেনীকে আটক করে লাভ কি?

ওকে মুক্তি দিতে হবে। বললেন মিঃ লোদী।

*

মিস লুনার গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়লো গাড়ি থেকে এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো।

কান্দাইয়ের চলচ্চিত্রও অভিনেত্রী মিস লুনা। শুধু সুন্দরী নয়, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীও বটে। তার ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই তার গর্ব তাই তার আনন্দ। অহংকারও আছে। আত্নগর্বে গর্বিতা মিস লুনা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করবার পূর্বে ড্রইংরুমে এসে দাঁড়ালো। ড্রইংরুম তার বন্ধুবান্ধবে গমগম করছে।

মিস লুনার বন্ধুবান্ধব এসেছে সুন্দর সন্ধ্যাটা মিস লুনার সঙ্গে আনন্দমুখর করে তুলতে নানাজনে নানা উপঢৌকন নিয়ে এসেছে নিজেদের খুশিমতো।

কেউ কেউ এসেছে লুনার গান শুনবে বলে।

মিস লুনা ভালো গাইতেও পারে।

লুনা কক্ষে প্রবেশ করতেই বন্ধুমহলের অনেকেই শিস দিলো, কেউ বা অভিবাদন জানালো, কেউ বা হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো।

মিস লুনাকে লক্ষ্য করে বললো এক বন্ধু–মিস লুনা, আজ আপনার একটা গান শুনবো বলে আমরা তৃষ্ণাতুর চাতকের মতো হা করে বসে আছি।

লুনা গর্বের হাসি হাসলো।

অপর একজন বললো–মিস লুনা, আজ আপনার কণ্ঠে ঐ হার দেখতে চাই, যে হার আপনি লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন।

বললো আর একজন–ঐ হার গলায় পরিধান করলে আপনাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনে

অপূর্ব মিস লুনা, তার কণ্ঠে লক্ষটাকা মূল্যের অপূর্ব হা..অপূর্ব সংযোজন বলা চলে! কথাগুলো বললো অন্য একজন।

আর একজন বললো–মিস লুনা, আপনাকে পুলিশমহল ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দস্যু বনহুরকে আপনি গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হননি বলে তারা আপনাকে……

মিস লুনা বললো–না, তারা আমাকে আমার পাওনা অর্থ থেকে বঞ্চিত করবে না, আমি আমার পারিশ্রমিক ঠিকই পাবো।

মিস লুনার বন্ধুদল সবাই আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

মিস লুনা পা বাড়ালো তার শয়নকক্ষের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করলো মিস রুনা, মুখে তার আত্নগর্বের ছাপ পরিস্ফুট। গুনগুন করে একটা গানের কলি আওড়াচ্ছে সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে ড্রেসিং টেবিলের

সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি আলমারীর আড়ালে সরে দাঁড়ালো। রিভলভারের উদ্যত নজলের আগাটার ছায়া পড়লো শুধু মেঝেতে।

মিস লুনা খুলে ফেলতো তার দেহের বসন এক এক করে। নতুন পোশাকে সজ্জিত হলো সে নতুন ভাবে! চুল আঁচড়ে নিয়ে প্রসাধনীর প্রলেপ মাখলো সে মুখে এবং দেহের উন্মুক্ত অংশগুলোতে।

তারপর ড্রয়ার খুলে বের করলো সেই মূল্যবান হারছড়া। যা পরে আজ তাকে বন্ধুদের সামনে গাইতে

হারছড়া গলায় পরলো মিস লুনা।

উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করে উঠলো তার কণ্ঠের হারছড়া। অপূর্ব লাগছে ওকে। মিস লুনা বারবার নিজেকে আয়নায় দেখে নিচ্ছিলো ভাল করে।

এবার মিস রুনা ফিরে দাঁড়ালো। বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলো। সে। মেঝেতে রিভলভারের ছায়াটা তার নজরে পড়লো। দু'পা পিছিয়ে তাকালো মিস লুনা মেঝেতে রিভলভারের ছায়াটার দিকে। চোখেমুখে তার ফুটে উঠলে ভীষণ ভীতির ভাব।

ছায়ামূর্তি সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, তার দক্ষিণ হাতে উদ্যত রিভলভার। এই রিভলভারের ছায়াই পড়েছিলো মেঝেতে।

মিস লুনা ধীরে ধীরে চোখ তুললো, চিৎকার করতে যাবে সে, ঐ মুহূর্তে বাম হাতে মিস লুনার মুখ চেপে ধরে দক্ষিণ হাতে রিভলভার তার বুকে চেপে ধরে বললো ছায়ামূর্তি–খবরদার, চিৎকার করবেন না মিস লুনা।

মিস লুনার দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠে, সে চাপাকণ্ঠে বললো কে তুমি!

মুখের কালো রুমালখানা সরিয়ে নিয়ে বলল ছায়ামূর্তি–ভালভাবে তাকিয়ে দেখুন মিস লুনা চিনতে পারেন কিনা?

মিস লুনা তাকিয়ে দেখলো ছায়ামূর্তির দিকে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো– দস্যু বনহুর!

হাঁ মিস লুনা, চিনতে পেরেছেন তাহলে

মিস লুনা, ভয়জড়িত কণ্ঠে বললো–জানো, পুলিশ বাহিনী তোমাকে খুঁজে ফিরছে।

জানি।

তবু এসেছো?

না এসে পারলাম না, কারণ আমি কান্দাইয়ের একটা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। আপনি অভিনয় দ্বারা দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবেন বলে পুলিশকে সহায়তা করতে গিয়েছিলেন। বিফলকাম হয়েছেন, তাই এসেছি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে। মিস লুনা, আপনাকে এ মুহূর্তে বেশিক্ষণ ধরে রাখবো না, কারণ বাইরে আপনার বন্ধুবান্ধব আপনার গান শুনবেন বলে অপেক্ষা করছেন। যান, কিন্তু যাবার পূর্বে আপনার ঐ মূল্যবান হারছড়া আমাকে দিয়ে যেতে হবে। ঐ হারছড়ার মূল্য দিয়ে অনেক দুঃখী মানুষের অমূল্য জীবন রক্ষা পাবে।

মিস লুনা নিজের গলায় হাত দিয়ে হারছড়ার অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো, চোখ দুটো ভয়–ভীতিতে কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, রক্তশূন্য মনে হচ্ছে তার গোটা মুখমন্ডল।

বনহুর বললো–দিন, চট করে খুলে দিন হারছড়া, নইলে এক্ষুণি আপনার মৃতদেহ সুন্দর কার্পেটখানার উপরে লুটিয়ে পড়বে।

বনহুর যখন কথা বলছিলো তখন তার দক্ষিণ হাতের রিভলভারখানা মিস লুনার বুকে চেপে বসে গিয়েছিলো। সে কোনো উক্তি উচ্চারণ করতে পারলো না, নীরবে গলার হারছড়া সে খুলে দিতে বাধ্য হলো দস্যু বনহুরের হাতে।

বনহুর বললো–সাবধান, ড্রইংরুমে গিয়ে কাউকে কোনো কথা বলবেন না যেন! মনে রাখবেন, আপনার বুক লক্ষ্য করে আমার রিভলভার উদ্যত থাকবে। কোনো কথা বন্ধুমহলে জানালে সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলী ছুড়বো। হাঁ, আপনি সোজা গিয়ে

বন্ধুদের গান শোনাতে পারেন, আমিও আড়াল থেকে শুনবো। যান, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

মিস লুনা মন্থর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো নিজ কক্ষ থেকে।

বন্ধুমহল এতক্ষণ অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছিলো। মিস লুনার শয়নকক্ষে প্রবেশ নিষেধ বলে কেউ তার বিলম্ব দেখেও তার শয়নকক্ষে প্রবেশে সাহসী হয়নি। এবার মিস লুনাকে মন্থরগতিতে বিষণ্ন মনে প্রবেশ করতে দেখে বন্ধুমহলের একজন বললো–মিস লুনা, হঠাৎ কি হলো আপনার?

মিস লুনা বললো– কিছু না।

কথাটা বলে বসে পড়লো সে একটা সোফায়। তার চোখে–মুখে ফুটে উঠেছে একটা ভয়বিহ্বল ভাব।

মিস লুনার বন্ধুবান্ধব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা উকুণ্ঠা নিয়ে তাকে ঘিরে ধরলো।

একজন বললো–কোনো অসুখ বিসুখ করেনি তো?

অপরজন বললো হঠাৎ কি হলো বলুন তো মিস লুনা?

মিস লুনার ম্লান মুখ সবাইকে ভাবিয়ে তুললো। সবাই মনে করলো, মিস লুনার কিছু না কিছু একটা ঘটেছে।

কেউ বললো–ডাক্তার ডাকবো কি?

কেউ বললো–ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দাও।

সবাই জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ তার কি হলো। তিনি তো বেশ সুস্থ অবস্থায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। তার শরীরে পূর্বের পোশাক নেই, নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছেন। প্রসাধনীর প্রলেপ পড়েছে তার অঙ্গে। তার সাজসজ্জায় এতটুকু ত্রুটি হয়নি অথচ তার চোখেমুখে কেন এমন এক ভয়বিহ্বল ভাব, কে জানে এর কারণ কি!

মিস লুনার কানের কাছে দস্যু বনহুরের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হচ্ছিলো সাবধান, ড্রইংরুমে গিয়ে কাউকে কোনো কথা বলবেন না যেন। মনে রাখবেন, আপনার বুক লক্ষ্য করে আমার রিভলভার উদ্যত থাকবে। কোনো কথা বন্ধুমহলে জানালে সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলী ছুড়বো। হাঁ, আপনি সোজা গিয়ে বন্ধুদের গান শোনাতে পারেন। আমিও আড়াল থেকে শুনবো......

মিস লুনা বারবার তাকাচ্ছে তার শয়নকক্ষের দরজার দিকে, নিশ্চয়ই ঐ পর্দার আড়ালে দুটি চোখ তাকে লক্ষ্য করছে। মিস লুনা পিয়ানোর সম্মুখে বসলো, তারপর গান গাইতে শুরু করলো সে।

ভয়বিহ্বল কম্পিত কণ্ঠস্বর মিস লুনার।

গান গাওয়া শেষ হলো।

বন্ধুবান্ধব মিস লুনার কণ্ঠে হারছড়া না দেখে আশ্চর্য হলো, কারণ তারা অনুরোধ জানিয়েছিলো তাকে মূল্যবান হারছড়া পরার জন্য।

একজন জিজ্ঞাসা করলো–মিস লুনা, আপনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেন নি বলে দুঃখিত।

অপরজন বললো–হাঁ, আমি মিঃ মেনিলার সঙ্গে একদম। আপনাকে আজ আমরা আপনার মূল্যবান হারছড়ায় সজ্জিত দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনি আমাদের কথা রাখতে চেষ্টা করেননি!

মিস লুনা বিমর্ষ মুখে বসে রইলো, সে কোনো জবাব দিলো না বন্ধুদের কথায়।

*

আজ কদিন থেকে মিস লুনা মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। সে তার মনের কথা বলতেও পারছে না কাউকে। অথচ অহরহ ঐ এক চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। দস্যু বনহুর শুধু তার হারছড়াই নিয়ে যায়নি, একটা চিঠিতে সে জানিয়ে গেছে আবার আসবে সে, প্রতি মাসে তাকে বিশ হাজার করে টাকা দিতে হবে কান্দাইয়ের দুঃস্থ জনগণের সাহায্যার্থে। মাসে কোন্ দিন কোন্ সময় সে আসবে তার কোনো সঠিক তারিখ সে জানায় নি চিঠিতে।

মিস লুনা অনেক ভেবেছে চিঠিখানা পুলিশ প্রধানকে দেখাবে কিনা, কিন্তু মন তাতে সায় দেয়নি। বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সে পুলিশমহলকে সহায়তা করতে গিয়েছিলো এবং সেই কারণেই তার এই বিপদ। শুধু বিপদ নয়, মহাবিপদ বলা চলে। পুলিশকে সহায়তা করার ব্যাপারে তাকে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তা তার জীবনে চরম ক্ষতি। শুধু তার মহা মূল্যবান হারছড়াই দিতে হয়নি, দিতে হবে মাসে মাসে বিশ হাজার টাকা, নাহলে দিতে হবে জীবন। কেনা নিজের জীবনকে ভালবাসে? মিস লুনাও তার জীবনকে ভালবাসে, কাজেই জীবন রক্ষার্থে তাকে তার কাজের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

কিন্তু মাসে মাসে বিশ হাজার টাকা……এত টাকা তাকে খেসারত দিতে হবে! যদিও সে প্রচুর টাকা রোজগার করে, তবুও মাসে মাসে বিশ হাজার টাকা কাউকে দেওয়া বা দান করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

বন্ধুবান্ধব এলে তাদের সঙ্গে পূর্বের মত মন খুলে মিশতে পারে না। মনের গোপন কথা তাকে সব সময় অন্যমনস্ক করে তোলে। নিজকে মিস না কিছুতেই পূর্বের মত স্বচ্ছ–স্বাভাবিক করতে পারে না।

বন্ধুমহল বলে, মিস লুনা বলুন তো আপনার কি হয়েছে।

লুনা বলে–কিছু হয়নি।

তবে অমন নিশ্চুপ হয়ে থাকেন কেন?

কিছু ভাল লাগে না।

তাহলে নিশ্চয়ই আপনার অসুখ বিসুখ হয়েছে।

তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

শুনলাম আপনি আজকাল সুটিংয়ে ঠিকমত যোগ দিচ্ছেন না?

হা।

কেন?

জানি না।

আপনার জন্য প্রযোজক–পরিচালক মহল মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। তাদের ক্ষতির কথাটা আপনি চিন্তা করেছেন?

করবার মত আমার মনের অবস্থা নেই।

তাহলে কি আপনি অভিনয় ছেড়ে দিতে চান?

না।

তবে?

আর আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন না, আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি নই।

একদিন পুলিশ প্রধান মিঃ লোদী কয়েকজন অফিসার সহ এলেন মিস লুনার বাসায় তাকে তার পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ দিতে। আজ লুনাকে তারা খুশি করবেন যেন প্রয়োজনবোধে পুনরায় সে তাদের সাহায্য করতে কোনোরকম দ্বিধাবোধ না করে।

মিস লুনা পুলিশ অফিসারগণকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে যাবে, এমন সমসয় সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর, তার ডান হাতে উদ্যত রিভলভার।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মিস লুনা।

বনহুর রিভলভার মিস লুনার বুকে চেপে ধরে বলল–মিস লুনা, পুলিশ প্রধান আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক প্রদান করতে এসেছেন, যদিও আপনি পরাজয় বরণ করেই ফিরে এসেছিলেন সেদিন, তবু তারা আপনাকে খুশি করতে চান।

মিস লুনা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে বনহুরের মুখের দিকে। এত কাছে বনহুর, পুলিশ মহলের লোকজনও এসেছেন অথচ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না সে! অসহ্য এক যন্ত্রণা তার চোখেমুখে ফুটে উঠে।

বনহুর বললো–মিস লুনা, আপনি শিগগির যান। পুলিশ প্রধান সহ পুলিশ অফিসারগণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ড্রইংরুমে নিয়ে বসান। আমি এই কক্ষে অপেক্ষা করছি। আপনার বুক লক্ষ্য করে আমার রিভলভার উদ্যত থাকবে।

আপনি পুলিশ অফিসারদের ঠিকভাবে আদর–আপ্যায়ন করবেন যেন আপনার মধ্যে তারা কোনোরকম উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য না করেন।

মিস লুনা ঢোঁক গিললো।

বনহুর বললো–আপনি টাকা এনে আমার হাতে দেবেন, আমি নীরবে চলে যাবো। তারপর আবার যখন সময় হবে তখন আসবো। যান, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে, যান বলছি......

মিস লুনা না গিয়ে পারলো না।

মুখ তার ফ্যাকাশে, দু'চোখে ভয়বিহ্বল ভাব ফুটে উঠেছে বেরিয়ে এলো সে কক্ষ থেকে বাইরে।

ততক্ষণে পুলিশ অফিসারগণ উপরে উঠে এসেছেন। তারা মিস লুনাকে দেখামাত্র হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকালেন তার মুখে।

কিন্তু আশ্চর্য মিস লুনার মুখ গম্ভীর ফ্যাকাশে, সে নিষ্প্রভ মুখে বললো–আসুন।

মিস লুনা আর পুলিশ অফিসারগণ আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ লোদী স্বয়ং এসেছেন, কারণ মিস লুনার দ্বারা তিনি পুনরায় সাহায্য কামনা করেন। তার ধারণা, পুলিশ মহল মিস লুনাকে বশীভূত রেখে কাজ সমাধান করতে পারবে।

মিস লুনার মুখোব পুলিশ অফিসারগণকে ভাবিয়ে তুললো, কারণ মিস লুনাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো না, কেমন যেন একটা ভয়ার্ত ভাব তার মুখে তারা লক্ষ্য করে বিচলিত হলেন।

বললেন মিঃ লোদী–মিস লুনা, আপনি কি অসুস্থ।

মিস লুনা ঢোক গিলে তাকালো নিজ কক্ষের দরজার পর্দার দিকে, তারপর বললো–না, অসুস্থ নই।

বললেন মিঃ কিবরিয়া–তাহলে আপনাকে এমন বিমর্ষ লাগছে কেন? আমাদের কাছে কিছু গোপন করবেন না মিস লুনা, কারণ আমরা সব সময় আপনাকে

সহায়তা করতে রাজি আছি.. ….

মিঃ লোদী বললেন, আমরা মিস লুনাকে সহায়তা করবো এবং তার কাছেও আমরা সহায়তা কামনা করবো। বলুন মিস লুনা, আপনার কোনো অসুবিধা বা কোনো কিছু…..

ব্যস্তকণ্ঠে বললো মিস লুনা, নানা, আমার কোনো অসুবিধা বা কোনো কিছু হয়নি। বেশ আছি, বেশ আছি। দিন আমার পারিশ্রমিকের অর্থ। হাত পাতলে মিস লুনা মিঃ লোদীর সম্মুখে।

মিঃ লোদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার তারা তার সঙ্গে এসেছিলেন সবাই কিছুটা অবাক না হয়ে পারলেন না। মিস লুনার আচরণ আজ তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হচ্ছে, কারণ সে নিজে এভাবে নিজের পারিশ্রমিক চাইবে– এটা যেন সাধু বিস্ময়কর নয়, কেমন যেন বেখাপ্পা।

মিঃ কিবরিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি বলবার পূর্বেই মিঃ লোদী মিস লুনার সম্মুখে টাকার বান্ডিলগুলো গুছিয়ে রাখলেন।

মিস লুনা টাকার বাণ্ডিলগুলো দু’হাতে তুলে নিলো।

বেশি কথা হলো না আজ তাদের মধ্যে।

মিঃ লোদী ও অন্যান্য অফিসার বিদায় গ্রহণ করলেন।

মিস লুনা নীরবে বিদায় সম্ভাষণ জানালো মিঃ লোদী এবং তার সঙ্গীদের, তারপর টাকার বান্ডিলগুলো নিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো। মিস লুনা জানে বনহুর তার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো কেউ নেই। সে চারদিকে তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে কিন্তু কোথাও কারও ছায়াটা নজরে পড়লো না।

ভাবলো মিস লুনা, নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর পুলিশের ভয়ে পালিয়েছে। কারণ সে জানে মিঃ লোদী জাদরেল পুলিশ প্রধান, তাই ভয়ে অন্তর্ধান হয়েছে সে। কিন্তু দস্যু বনহুর এত সহজে চলে গেলো……কোন পথে কেমন করে গেলো সে।

বয়-বাবুর্চি কেউ আজও টের পায়নি কোনদিক দিয়ে তার আগমন হয়, আবার কোনদিক দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। আশ্চর্য লোক এই দস্যু বনহুর। যাক, সে চলে গেছে, বেঁচে গেলো সে তাহলে এ যাত্রা। মিস লুনা টাকার বান্ডিলগুলো তুলে নিলো একটা ব্যাগের মধ্যে, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

গাড়ি–বারান্দায় গাড়ি অপেক্ষা করছিলো।

ড্রাইভার বসে ছিলো ড্রাইভ আসনে।

মিস লুনা মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ির পিছন আসনে উঠে বসলো, ব্যাগটা রাখলো নিজের কোলের উপর। তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো– লাউসলাং ব্যাঙ্কে চলো।

আচ্ছা! বললো ড্রাইভার।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

লাউসলাং ব্যাঙ্ক কান্দাইয়ের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক না হলেও দ্বিতীয় স্থানীয় ব্যাঙ্ক বলা চলে। মিস লুনা মনে করলো, দস্যু বনহুরকে ফাঁকি দিতে হলে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখাই ভালো। তাই মিস লুনা চলেছে। ব্যাঙ্কে তার পারিশ্রমিকের টাকাটা রাখার জন্য।

গাড়িখানা স্পীডে ছুটে চলেছে।

মিস লুনা ভাবছে দস্যু বনহুরের কথা, কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বনহুরের উক্তিগুলো।

কতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসেছিলো মিস লুনার খেয়াল নেই। হঠাৎ গাড়িখানা থেমে পড়লো, সম্বিৎ ফিরে পেলো মিস লুনা। কিন্তু একি! এখানে ব্যাঙ্ক কোথায়? এ যে নির্জন এক বস্তি এলাকা!

মিস লুনা বললো–ড্রাইভার, এ তুমি কোথায় এনেছো?

এবার ড্রাইভার ফিরে তাকালো, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো–এটাই ঠিক জায়গা মিস লুনা।

একি, তুমি দস্যু বনহুর!

হাঁ, আমি.......নেমে পড়ুন মিস লুনা।

এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছো।

ততক্ষণে ড্রাইভারবেশী দস্যু বনহুর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে, বলে ও নেমে আসুন মিস লুনা।

কেন আমি এখানে নামবো?

টাকার ব্যাগ নিয়ে নেমে আসুন, পরে জানতে পারবেন......কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর রিভলভার বের করে ধরলো মিস লুনার সম্মুখে।

মিস লুনা এবার ভয়বিহ্বল ভাবে ব্যাগসহ নেমে পড়লো বাধ্য ছাত্রীর মতো।

বনহুর তার কানে মুখ নিয়ে বললো–মিস লুনা, আমি যেভাবে যা বলবো আপনি সেইভাবে কাজ করবেন যদি, জীবন নিয়ে নিজ বাসায় ফিরে যেতে চান।

মিস লুনা রাগে–ভয়ে নীরব হয়ে গেছে, সে কোনো জবাব দিলো না বনহুরের কথায়।

বনহুর বললো–আসুন আমার সঙ্গে।

মিস লুনা অগ্রসর হলো যন্ত্রচালিত পুতুলের মত। বনহুর তার অগ্রভাগে এগিয়ে চলেছে। অদূরে বস্তির ঘরে ঘরে তখন জ্বলে উঠেছে সন্ধ্যা প্রদীপ।

বনহুরকে দেখামাত্র বস্তির শিশু, যুবক, বৃদ্ধ নারী–পুরুষ সবাই তার চারদিকে এসে ভিড় জমিয়ে দাঁড়ালো। সবার মুখেই খুশির উচ্ছ্বাস, চোখেমুখে আনন্দদ্যুতি খেলে যেতে লাগলো। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে বনহুরকে দেবদূতের মতো সুন্দর লাগছে।

বস্তির জনগণ তাকে ঘিরে ধরে হর্ষধ্বনি করতে লাগলো। মিস লুনাকে তারা মনে করেছে তাদের দেবদূতের স্ত্রী। তাই তারা আরও বেশি করে আনন্দধ্বনি করছে।

বনহুর সবাইকে লক্ষ্য করে বললো–আজ আমার বোন মিস লুনা এসেছে তোমাদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করতে। তোমরা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে এসো। যার যা প্রয়োজন তোমরা তার কাছে পাবে। মিস লুনা, দিন, আপনার ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আমি টাকা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি, আপনি দুঃস্থ বস্তিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করুন।

মিস লুনার বুকটা ধকধক করছে, সন্ধ্যার অন্ধকার যত বাড়ছে ততই ভীতিভাব জাগছে তার মনে। টাকার মায়ার চেয়ে তার জীবনের মায়া অনেক বেশি। স্বয়ং দস্যু বনহুর যে তার ড্রাইভারের বেশে তাকে নিয়ে আসবে কোনো এক অজানা বস্তিতে তা ভাবতেই পারেনি মিস লুনা। কোথায় ব্যাংক আর কোথায় বস্তি.......

মিস লুনার চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যায়। বনহুর তার হাতে গুঁজে দেয় কিছু টাকা, তারপর বলে মিস লুনা, দিন আপনার সম্মুখের লোককে দিন।

মিস লুনা যন্ত্রচালিতের মত টাকাগুলো তুলে দিলো সম্মুখস্থ ব্যক্তিটার হাতে।

বনহুর পুনরায় টাকা দিলে মিস লুনার হাতে।

সম্মুখের ব্যক্তি সরে গেলো অপরজন এসে সম্মুখে দাঁড়ালো। মিস লুনা তার হাতে অর্থ সমর্পণ করলো। এমনি করে অল্পক্ষণের মধ্যেই বনহুর মিস লুনার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ বিলিয়ে দিলো বস্তির অসহায় দুঃস্থ জনগণের মধ্যে।

জনগণ আনন্দধ্বনি করতে লাগলো।

বনহুর বস্তিবাসীদের লক্ষ্য করে বললো–আমার বোন মিস না তোমাদের দুঃখ–কষ্টে ব্যথিত। তাই সে এসেছে তার উপার্জনের কিছু অর্থ তোমাদের মধ্যে দান করতে। তোমরা যে অর্থ আজ মিস লুনার কাছে থেকে পেলে তা দিয়ে কিছুদিন তোমাদের সুন্দরভাবে কাটবে। আবার বোন মিস লুনা আসিবে যখন তোমাদের প্রয়োজন হবে......

সবাই মিস লুনার জয়ধ্বনি করে উঠলো। সবার মুখেই হাসির উচ্ছ্বাস। বৃদ্ধ যারা তারা প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগলো।

....মা তোমার মঙ্গল হোক......তুমি চিরসুখী হও...দীর্ঘজীবী হও.......

বনহুর যখন সবার হর্ষধ্বনির সঙ্গে হাত নাড়ছিলো তখন মিস লুনা দাঁতে দাঁত চেপে মনের রাগকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছিলো।

বস্তির অনেকেই লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছিলো। লণ্ঠনের আলোতে মিস লুনা দস্যু বনহুরকে দেখলো ভাল করে। সে এতদিন ওকে ভাল করে লক্ষ্য করেনি। সত্যি বনহুর সুপুরুষ ঘটে! দীপ্ত বলিষ্ঠ মুখমন্ডল, তেমনি তার সুঠাম সুন্দর দেহ! কিন্তু সে তার চরম ক্ষতি সাধন করলো–তার এতগুলো টাকা আজ তার নিজ হাতে বিলিয়ে দিতে হলো......

বনহুর বললো–কি ভাবছেন মিস লুনা? চলুন, গাড়িতে উঠে বসুন এবার।

মিস লুনা যেমনভাবে গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলো নীরবে, তেমনি নীরবে গাড়িতে উঠে বসলো।

বনহুর বসলো ড্রাইভ আসনে।

বস্তির মানুষগুলো গাড়িখানার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে লাগলো।

মিস লুনা নির্বাক, একদিকে ভয়ভীতি, অন্যদিকে মনের চাপা রাগ তাকে বাকহীন করে ফেলেছে।

বনহুর মিস লুনাকে নিয়ে ফিরে চলেছে বস্তি এলাকা ছেড়ে শহরের দিকে।

রাজপথে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘন জমাট হয়ে এসেছে। পথের দু'পাশের দোকানগুলোতে ইলেকট্রিক আলোগুলো জ্বলছে আর নিভছে।

মিস লুনা চুপচাপ বসে আছে।

বনহুর ড্রাইভ করে চলেছিলো। কেউ কোনো কথা বলছে না।

অনেকক্ষণ ওরা নীরব ছিলো।

মিস লুনা লক্ষ্য করছে তাকে ঠিক তার বাসার পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা। লুনা ভেবেছিলো তাকে দস্যু বনহুর ভুলপথে নিয়ে যাবে এবং তার উপরে হয়তো চালাবে অকথ্য অত্যাচার, কারণ সে একদিন দস্যু বনহুরকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে ছিলো এবং তাকে পুলিশমহল গ্রেপ্তারও করেছিলো কিন্তু বনহুরকে পুলিশ আটক করতে পারেনি......

কি ভাবছেন মিস লুনা? ড্রাইভ আসন থেকে বললো বনহুর।

মিস লুনার সম্বিৎ ফিরে এলো, বললো–ভাবছি কতবড় শয়তান তুমি!

কেন, আমি আপনার কি ক্ষতিটা করলাম? বরং আপনার উপকার করেছি, যদিও আপনি আমাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

মিস লুনা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো–তুমি আমার উপকার করেছে?

উপকার নয় তো কি মিস লুনা? আপনার অসৎ উপায়ে অর্থের সঙ্গতি করে দিয়েছি, মানে আপনি যে অর্থ উপার্জন করেছেন বা করেন তা মোটেই সৎ উপায়ে নয়.....

কে বললো আমার উপার্জিত অর্থ অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করা?

আমি বলছি, কারণ আপনি নিজের নগ্নদেহ পর্দায় তুলে ধরে প্রয়োজক মহলকে লাভবান করে আপনি যে অর্থ সংগ্রহ করেন তা মোটেই ন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ বলে আমি মনে করি না। অর্থ উপার্জন এত সহজে হয় না, যেভাবে আপনি করেন। যা ঐ অর্থ যদি আপনি কিছু কিছু দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেন তাহলে আপনার উপার্জন সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

ড্রাইভ করতে করতেই কথাগুলো বললো বনহুর।

মিস লুনা পিছন আসন থেকেই জবাব দিচ্ছিলো।

লাইটপোষ্টের আলো মাঝে মাঝে ধাবমান গাড়িখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিলো। সেই আলোতে বনহুরকে ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো মিস লুনা। ভাবছিলো, সত্যি, দস্যু হলেও সে মহৎ ব্যক্তি তার সঙ্গে সে রূঢ় আচরণই করে এসেছে। সে এতদিন দস্যু বনহুরের নামই শুনে এসেছিলো কিন্তু তাকে যে এমনভাবে দেখতে পারে, কোনোদিন ধারণা করেনি। পুলিশ মহল থেকে যখন তাকে জানানো হলো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে পুলিশ মহলকে সহায়তা করতে হবে, তখন মিস লুনা প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলো, বলেছিলো আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি? বলেছিলেন পুলিশ মহলের ব্যক্তিগণ, অভিনয় দ্বারা আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ মহলকে সহায়তা করবেন। মিস লুনা প্রথমে রাজি হয় নি, কারণ দস্যু বনহুরকে সে না দেখলেও তার সম্বন্ধে সবকিছু জানতো। আর জানতো বলেই মিস লুনা ঘাবড়ে গিয়েছিলো প্রথমে। তারপর তাকে নানা ভাবে রাজি করানো হয়েছে। বনহুরকে প্রথম যেদিন সে ঐ ফিরু পাহাড়ের পাদমূলে দেখলো তখন তার স্বাভাবিক সত্তা ছিলো না। তা ছাড়া বনহুরের চেহারা সেদিন ছিলো ছন্নছাড়া উদভ্রান্তের মত। আজ সেই বনহুরকে মিস লুনা স্পষ্টভাবে দেখছে–উপলব্ধি করছে তার অস্তিত্ব।

আজ বনহুরের কথাগুলো তার কাছে বড় অশোভনীয় লাগলেও সে রাগান্বিত হলো না। বনহুর মিথ্যা বলেনি, তার অর্থ কতখানি সৎ উপায়ে উপার্জিত তা সে নিজেও জানে না। বনহুর যা বললো মিথ্যা নয়, প্রযোজকদের লাভবান করার জন্য পরিচালকদের কথামত বা রুচিমত তাকে প্রায় নগ্নদেহে অভিনয় করতে হয়। শত শত দর্শককে তার সুঠামদেহের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে নানা অঙ্গভঙ্গীতে লিপ্ত হতে হয়। জানা অজানা পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা আর প্রেমের অভিনয়ে নিজকে নিমজ্জিত করতে হয়……

কি ভাবছেন?

না, কিছু না।

এই আপনার রাণীকুঞ্জ এসে গেছে!

মিস লুনা তাকিয়ে দেখলো মিথ্যা নয়, সত্যিই গাড়িখানা তার বাসার গেটে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মিস লুনা আশ্চর্য হলো, কারণ সে ভাবতে পারেনি দস্যু বনহুর

তাকে এত সহজে তার বাসায় পৌঁছে দেবে। ভেবেছিলো হয়তো বা তাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত করবো।

বনহুরের দেহে ছিলো ড্রাইভারের পোশাক।

ড্রাইভ আসন থেকে নেমে পড়লো বনহুর, তারপর গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললো–নেমে আসুন মিস লুনা।

মিস লুনা নেমে পড়লো।

বনহুর বললো–যান! আবার আসবো সময় হলে।

মিস লুনা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো। গাড়ি–বারান্দার উজ্জ্বল আলোতে বনহুরকে সে ভালভাবে দেখলো।

বনহুর বেরিয়ে গেলো।

তখনও স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মিস লুনা ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

চাকর ছোকরার কথায় সংজ্ঞা ফিরে এলো মিস লুনার।

চাকর ছোকরা বললো–মেম সাহেব, দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে।

বললো মিস লুনা–চল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে চললো মিস লুনা।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই ফ্যাইং লেডী জিমস্ মেরী’ ছবির প্রযোজক এবং পরিচালক তাকে অভিবাদন জানালেন। বললেন পরিচালক মিস সুনা, হঠাৎ এভাবে বাইরে গেছেন কাউকে কিছু না জানিয়ে? কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো?

মিস লুনা গম্ভীর মুখে বললো–আমি কোথায় যাই বা থাকি তা আপনাদের জানার কথা নয়। বলুন, কি বলতে এসেছেন আপনারা?

এবারও পরিচালক কথা বললেন–কাল যে দৃশ্যটা গ্রহণ করা হবে, তার পূর্বে আপনি যে ড্রেসে সজ্জিত হবেন, সেই ড্রেস আমরা এনেছি, আপনি এটা পরে আমাদের সম্মুখে এলে আমরা খুশি হবো। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক একটা প্যাকেট এগিয়ে ধরলেন মিস লুনার দিকে।

মিস লুনা গম্ভীর মুখে প্যাকেটটা হাতে নিলো, তারপর প্যাকেট খুলে তার ড্রেস বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছে মিস লুনা ফ্যাইং লেডী জীম মেরী'র পরিচ্ছদটা।

প্রযোজক বলে উঠলেন–ড্রেসটা যা মানাবে আপনাকে তা কি বলবো মিস লুনা, এই ড্রেস আপনার যৌবন–ঢল ঢল সৌন্দর্যভরা দেহের প্রায় সকল অংশই দর্শকমহলকে আকৃষ্ট করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই……

অন্যদিন হলে প্রযোজকের কথায় খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠতে মিস লুনা, কিন্তু আজ সে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো, ফ্যাইং লেডী জীম মেরীর নগ্নদেহী ড্রেসটা ফেলে দিলো প্রযোজকের মুখমন্ডল লক্ষ্য করে, তারপর সে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলো শয়নকক্ষের দিকে।

হতভম্ব হলেন ফ্যাইং লেডী জীম মেরী' ছবির পরিচালক এবং প্রযোজক, তারা অনেকদিন থেকে মিস লুনার সঙ্গে পরিচিত কিন্তু তার কাছে কোনোদিন এমন আচরণ আশা করেন নি।

মিস লুনা পোশাকটা যখন ছুঁড়ে ফেলে দিলো প্রযোজক ভদ্রলোকের মুখ লক্ষ্য করে, তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন উভয়ে। হঠাৎ মিস লুনার হলো কি, কেন সে এমন ব্যবহার করলো, কিছুই বুঝতে পারলেন না তারা।

মিস লুনা কক্ষে প্রবেশ করে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো। সে ভাবলো না যারা তাকে এতদিন এত আদরযত্ন করেছেন, যাদের অর্থে তার এত মান সম্মান, এত সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য, গাড়ি বাড়ি–সে তাদেরকেই আজ করলো অপমান। ঠিকই করেছে সে, আর সে ঐ ধরনের পোশাক পরবে না, তার যৌবন–চল ঢল নগ্নদেহ আর সে দর্শকমহলের সম্মুখে তুলে ধরবে না……

বনহুরের কথাগুলো তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে…উপকার নয় তো কি মিস লুনা, আপনার অসৎ অর্থের সৎগতি করে দিয়েছি, মানে আপনি যে

অর্থ উপার্জন করেছেন বা করেন তা মোটই সৎ উপায়ে নয়......।

......কে বললো আমার উপার্জিত অর্থ অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করাঃ.....

......আমি বলছি, কারণ আপনি নিজের নগ্নদেহ পর্দায় তুলে ধরে প্রযোজক মহলকে লাভবান করে আপনি যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তা মোটেই ন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ বলে আমি আমি মনে করি না। অর্থ উপার্জন এত সহজে হয় না যেভাবে আপনি করেন। যাক, ঐ অর্থ যদি আপনি কিছু কিছু দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেন তাহলে আপনার উপার্জন সার্থক বলে বিবেচিত হবে......

তখন বনহুরের কথাগুলো তার কাছে বড় অশোভনীয় লাগলেও এখন তার কানে কথাগুলোর প্রতিধ্বনি বড় সুন্দর মধুর লাগছে। ওর বলিষ্ঠদ্বীপ্ত মুখমন্ডল ভেসে উঠছে মিস লুনার চোখের সামনে......

ফ্যাইং লেডী জীম মেরীর পরিচালক–প্রযোজক কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হলেও তারা বিদায় গ্রহণ করলেন না। মিস লুনা বিগড়ে গেলে চলবে না, কারণ তাদের ছবির কাজ অর্ধেক প্রায় সমাধা হয়ে এসেছে। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ ছবি নির্মিত হচ্ছে। মিস লুনাই তাদের ছবির প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছে, সেই যে তাদের একমাত্র ভরসা।

কিন্তু অনেক সাধ্য–সাধনা করা সত্ত্বেও মিস লুনা দরজা খুললো না।

বিফল মনে এক সময় ফিরে গেলো পরিচালক এবং প্রযোজক মহোদয়। হঠাৎ মিস লুনার কি হলো, কেন সে তাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করলো কে জানে! আগামীকাল তাদের আউটডোর শুটিং আছে, মিস লুনার ফ্যাইং–এর শট নেওয়া হবে।

বাসায় ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন পরিচালক এবং প্রযোজক সাহেব। লুনার সঙ্গে তাদের অনেক কথা ছিলো কিন্তু কোনো কথাই হলো না।

পরিচালক বললেন–মিস লুনার কাছে ফোন করুন, নইলে সব মাটি হয়ে যাবে! আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে......

প্রযোজক বললেন–এইমাত্র আমরা সেখান থেকে এলাম, এরই মধ্যে ফোন করে কোনো জবাব পাওয়া যাবে বলে মনে করি না।

তবু করতে হবে। বললেন পরিচালক।

কিন্তু ফোন করেও কোনো জবাব পেলেন না তারা।

মিস লুনা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভেবে চলেছে, সত্যিই সে পরিচালক আর প্রযোজকদের হাতের পুতুল, তাকে দিয়ে তারা যা খুশি তাই করাচ্ছে। তার বিনিময়ে পাচ্ছে প্রচুর অর্থ! তার যা প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক বেশি সে পাচ্ছে। কিন্তু এত ঐশ্বর্য–প্রাচুর্য থেকেও সে সত্যি কি সুখী? মিস লুনা নিজের মনকে প্রশ্ন করে।

ওদিকে টেবিলে ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে একটানা বেজে চলেছে। সেদিকে লক্ষ্য নেই মিস লুনার। সে ভেবেই চলেছে, অভিনয় জীবন তার সত্যি সার্থক কিনা। গত জীবনের সবগুলো কথা একটার পর একটা ভেসে উঠছে তার মানসপটে। জীবনে সে অনেকের সঙ্গে মিশেছে, অনেকের অনেক কথাই তার মনকে আকৃষ্ট করেছে কিন্তু দস্যু বনহুর যা বললো তা তাকে শুধু আকৃষ্ট করেনি। তার অন্তরে তীরফলকের মত বিদ্ধ হয়ে বসে গেছে। নিজকে মিস লুনা যতই অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করছিলো ততই আরও গভীরভাবে তার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করছিলো দস্যু বনহুর।

মিস লুনা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, পায়চারী করতে লাগলো সে আপন মনে। তখনও ফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে চলেছে।

এবার মিস লুনা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, তার সুন্দর চিন্তাধারাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিলো ঐ ফোনের শব্দটা। সে রাগতভাবে গিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো টেবিলে।

*

দস্যু নিরুসিং বসে আছে।

সমস্ত শরীরে তার ভস্ম মাখানো। ললাটে চন্দনের তিলক। মাথায় জটাজুট, হাতে গাঁজার কলকে। তার সম্মুখে দন্ডায়মান কয়েকজন লোক, তাদের চোখমুখে হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে।

এইমাত্র তারা কোথা থেকে দস্যুতা করে ফিরে এসেছে যেন। সবার হাতেই অস্ত্র, মুখে গালপাট্টা বাধা। লুটের দ্রব্যগুলো সম্মুখে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। সন্ন্যাসীবেশী দস্যু নিরুসিং অনুচরদের মধ্যে লুণ্ঠিত মালামাল ভাগাভাগি করে দিয়ে বলল–তোমরা যাও, বিশ্রাম করো গে।

সবাই চলে গেলো।

একজন দাঁড়িয়ে রইলো। নেড়ে মাথা, লম্বা টিকি, লম্বা গোঁফ, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, হেঁ হেঁ করে হেসে বললো–দলপতি, এবার হুকুম করুন, কিছু নাচ–গান হোক। আজকের আসরে নাচবে মনিমালা।

হাঁ, ঠিক বলেছো মালোয়া। তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি নীলমণি পাথরই শুধু আননি, সেই সাথে তুমি যে সম্পদ এনেছে তার দাম সাতরাজার ধন নয়, হাজার রাজার ধন।

দলপতি, তুমি একদিন আমাকে তোমার দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, এখন বুঝতে পেরেছে আমি কেমন লোক। মণিমালাকে নিয়ে আসার পর থেকে তুমি লালে লাল হয়েছে আর হচ্ছে। কিন্তু মনে রেখো দলপতি, আমাকে যেন ঠকাতে চেষ্টা করো না।

না না, তা কোনোদিন করবো না। তাছাড়া নীলমনি হার তত তোমারই আছে, কারণ যতদিন মণিমালা উপযুক্ত না হয়েছে ততদিন তার গলায় থাকবে ঐ নীলমনি হার, তারপর......থামলো। নিরুসিং।

বললো মালোয়া–মণিমালা মানে ফুল্লরা উপযুক্ত হতে আর বিলম্ব নেই। দলপতি, আজই তুমি তার প্রমাণ পাবে।

মালোয়া কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো মালোয়া, নেড়ে মাথা, একজোড়া গোফ নাকের দু’পাশে ঝুলছে। মালোয়ার এটা ছদ্মবেশ, কারণ কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে, বিশেষ করে বনহুরের কোনো অনুচর বা বনহুর স্বয়ং তাকে যেন না চেনে, এজন্যই মালোয়া মাথা নেড়ে করেছে এবং একটা লম্বা টিকি রেখেছে। নিজকে সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষরূপে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে।

সত্যিই মালোয়াকে দেখলে কেউ সহজে চিনতে পারবে না। এমন কি তার পরিচিত কোনো লোকও চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ কিন্তু ফুল্লরা তাকে চিনতে ভুল করে না, মালোয়া যে তাকে চুরি করে নিয়ে এসেছে এখানে, এটা সে কোনদিন ভুলবে না।

এখানে আসার পর ফুল্লরার নাম ওরা কয়েকবার পাল্টিয়েছে। তবু সে জানে তার নাম ফুল্লরা। বয়স কম হলেও ফুল্লরা ছিলো অত্যন্ত চালাক মেয়ে, সে মনের দুঃখ–ব্যথা চেপে নিজকে ওদের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলো। ওরা যখন যা বলে তাই সে শোনে এবং করে, কারণ তাকে বাঁচতে হবে এবং একদিন এখান থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে।

সেখানে আরও ছোট–বড় মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে খেলা করে, একসঙ্গে নাচ শেখে সে। তবে সবার চেয়ে ভাল নাচতে শিখেছে ফুল্লরা।

মালোয়া ফুল্লরাকে নিয়ে এলো।

বেশ বড় হয়েছে সে এখন।

আগের চেয়ে অনেক লম্বা হয়েছে।

ডাগর ডাগর দুটি চোখে মায়াভরা চাউনির ছাপ পড়েছে। লালচে চুলগুলো আরও ঘন কোঁকড়ানো হয়েছে। সুন্দর ললাটে রেশমের মতো চুলগুলো ছড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ। ভারী সুন্দর লাগে ওকে!

নিরুসিং ওকে যত দেখে ততই মুগ্ধ হয়ে যায়, ভাবে আরও কিছুদিন কাটলে ফুল্লরা তার আনন্দদায়িনী হবে। তার হাতের মুঠায় আছে সে, কেউ তার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। মালোয়া সে তো তার নখের যোগ্য ব্যক্তি। যে কোনো মুহূর্তে ওকে নিরুসিং পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারে। নীলমনি আর মণিমালা কোনোটাই সে পাবে না।

মালোয়া বললো–নাচো মণিমালা। নাচো এবার......

মালোয়ার হাতে চাবুক ছিলো। ঐ চাবুক দ্বারা শুধু ফুল্লরাকেই ভয় দেখানো হয় না, ঐ চাবুক দ্বারা আরও বহু তরুণীকে বশীভূত করা হয়েছে, নাচতে গাইতে

আরও অনেক কিছুতে বাধ্য করা হয়েছে। ঐ চাবুক দেখলেই অসহায়া তরুণীদের বুকের রক্ত জমে যায়।

ফুল্লরা ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো মানোয়ার হাতের চাবুকটার দিকে, তারপর সে নাচতে শুরু করলো।

ফুল্লরার নাচের তালে তালে করতালি দিতে লাগলো নিরুসিং।

মালোয়া চাবুক হাতে সম্মুখে দাঁড়ালো।

নিরুসিংয়ের চোখে আনন্দদ্যুতি খেলে যায়, মনিমালা বড় হলে তাদের কোনো অভাব থাকবে না। মনিমালা নাচবে গাইবে, তখন চারদিক থেকে আসবে লাখ লাখ টাকা......

ফুল্লরার গলায় নীলমনি হাড়ছড়া তখন মশালের আলোতে ঝকমক করছে।

ফুল্লরার নাচ অদ্ভুত।

ছোট্ট একটা বালিকা এত সুন্দর নাচতে পারে, কেউ না দেখলে ঠিক বুঝতে পারবে না।

এক সময় নাচ শেষ হলো।

নিরুসিং ফুল্লরাকে টেনে নিলো কাছে।

মালোয়া চট করে ফুল্লরার হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে বললো–মনিমালা আমার! তুমি হাত বাড়াচ্ছো কেন?

নিরুসিং বললো–মনিমালাকে এনে দিয়েছে বলেই তুমি সেদিন আমার আড্ডাখানায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে, নইলে যে অপরাধ করে তুমি ভেগেছিলে তার শাস্তি ছিলো মৃত্যুদন্ড। কিন্তু তোমাকে জীবনভিক্ষা দিয়েছি শুধু......।

মালোয়া দলপতির কথার মাঝখানে বলে উঠলো+কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ আমি এনেছি শুধু তোমার জন্য নয় দলপতি।

তবে কার জন্য?

অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার।

না, সব আমাকে দিতে হবে, তারপর আমি যা বিবেচনা করে দেবো, তাই তোমার হবে মালোয়া

না! বললো মালোয়া।

দলপতি নিরুসিং বললো–আমি যা বলবে তাই হবে।

মালোয়র হাতের মুঠায় ফুল্লরার হাতখানা পিষে যাচ্ছিলো। তবু সে নিশ্চুপ ছিলো ভয়ে আতঙ্কে, ওরা যদি তাকে হত্যা করে ফেলে! অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলো ফুল্লরা ওদের উভয়ের মুখে।

মালোয়া দলপতির কথায় জবাব না দিয়ে ফুল্লরাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

নিরুসিং বললো–কি, এত স্পর্ধা তোর মালো, তুই আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিবি! না, কখনও তা হতে দেবো না.......নিরুসিং উঠে দাঁড়ালো, তারপর করতালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক এসে দাঁড়ালো নিরুসিংয়ের সম্মুখে। নিরুসিং বললোকথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

একজন বললো–কি কথা বলো দলপতি।

শোন, মালো যে অপরাধ করে ভেগেছিলো তোমরা তা জানো?

বললো অপরজন–জানি দলপতি। আর আমরা এও জানি তাকে কি কারণে তুমি ক্ষমা করেছে।

তাহলে তোমাদেরকে বেশি করে বুঝিয়ে বলতে হবে না, কি বলো?

হাঁ, আমরা সব জানি। বলো দলপতি হুজুর, কি করতে হবে? কথাটা চাঁদরাম বললো।

নিরুসিং চাপাকণ্ঠে বললো–মালোয়া সেদিন যা বলেছিলো আজ তা ভুলে গেছে। মনিমালা সহ নীল মনিহারের প্রতি মালোয়ার লোভ জন্মেছে।

আমারও তাই মনে হয়, কারণ সে আজকাল যখন তখন মণিমালাকে কাছে নিয়ে আদর করে। মাঝে মাঝে নাচায়...তারপর......

আর কোনো কথা শুনতে চাই না, যা বলি শোনো!

বল দলপতি হুজুর?

বলছি, যখন মালোয়া ঘুমাবে তখন তাকে হাত-পা–মুখ বেঁধে নিয়ে যাবে, তারপর তাকে জীবন্ত পুঁতে .. ফেলবে মাটির নিচে। তারপর মণিমালা আমার হবে, আর নীলমনি হারও আমার হবে, কেউ বাদ সাধতে পারবে না। কোনোদিন...... হাঃ হাঃ হাঃ যাও তোমরা প্রস্তুত থাকবে, আজ রাতে মালোয়াকে চিরদিনের মত বিদায় করবে পৃথিবীর বুক থেকে....

আচ্ছা, আমরা প্রস্তুত থাকবো। কথাটা বলে বেরিয়ে যায় চাঁদরাম ও তার সঙ্গীরা।

*

গভীর রাতে মালোয়া যখন অঘোরে ঘুমাচ্ছিলো তখন তিনজন লোক প্রবেশ করলো তার ঘরে। তারা অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলো মালোয়ার দিকে।

নাক ডাকছে মালোয়া।

লোকগুলো মালোর মুখে কাপড় খুঁজে হাত-পা বেঁধে ফেললো, তারপর তুলে নিলো কাঁধে।

মালোয়ার ঘুম ভেঙে গেলেও সে কিছু করতে পারলো না। দিশেহারা মত শুধু হাত-পা ছড়তে লাগলো। ততক্ষণে তাকে নিয়ে নিরুসিংয়ের লোকজন জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।

কয়েকজন মাটি খুড়ে গর্ত তৈরি করে রেখেছিলো।

লোক ক'জন মালোয়ার হাত-পা–মুখ বাধা দেহটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে দ্রুত মাটিচাপা দিলো। তারপর তারা আড্ডায় ফিরে যাবার জন্য কিছুটা পথ এগিয়েছে, অমনি তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো মালোয়া!

সবাই ভূত দেখার মত চমকে উঠলো, ভয়ে ফ্যাকাশে ও রক্তশূন্য হয়ে উঠলো তাদের মুখমন্ডল।

মালোয়া তখন বিকট শব্দে অট্টহাসি হাসছে।

মশালের আলোতে মালোয়র চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

[পরবর্তী বই দস্যু বনহুর ও মিস লুনা]

পূর্ববর্তী:

« ৬.১২ নররাক্ষস ও দস্যু বনহুর

পরবর্তী:

৬.১৪ দস্যু বনহুর ও মিস লুনা »